জলে ডাঙায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

জলেস্থলে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এশিয়া
পাবলিশিং
কোম্পানি
কলিকাতা-বারো

প্রকাশনায়
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ ১৩২, ১৩৩, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
রূপশ্রী আর্ট প্রেস
১১-বি হিদারাম ব্যানার্জি লেন
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ
সুকুমার নন্দী

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১, ১৩৭৭
এপ্রিল ১৫, ১৯৭০

॥ দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা ॥

জলেস্থলে

টুকলু-কে
দিলাম
মেসোমশাই

সূচীপত্র

সাগর রহস্য

তোমাদের মধ্যে যারা পুরীতে গিয়েছো তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো বিকেলবেলায় জেলেরা নৌকো বোঝাই করে' যে-সব সমুদ্রের মাছ ধরে' আনে, কী অদ্ভুত তাদের চেহারা! যে-সব নদীর মাছ দেখে ও খেয়ে আমাদের অভ্যেস, তার সঙ্গে এতটুকু মিল নেই। কোনোটা গোল, কোনোটা চ্যাপ্টা ঢঙের, কোনোটা সাপের মত লিকলিকে লম্বা। সমুদ্রের প্রাণীদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে দেখতে তারা অদ্ভুত। শুধু অদ্ভুত বললে কিছুই বলা হয় না। কোনো-কোনো প্রাণী বিকট ভয়ঙ্কর, আবার কোনো-কোনো প্রাণী অপরূপ সুন্দর। আমাদের দেশে এদেরকে চোখে দেখবার বড় একটা উপায় নেই, এ আমাদের মস্ত বড় দুর্ভাগ্য। ইয়োরোপ আমেরিকার প্রত্যেক বড় শহরেই aquarium (জল-জন্তুর চিড়িয়া-খানা) আছে, কিন্তু এত বড় ভারতবর্ষে একটিমাত্র aquarium—মাদ্রাজে। এবং বেশির ভাগ বাঙালীর জীবনেই তা দেখবার সুযোগ ঘটে না।

আমরা ডাঙার জীব। আমাদের এ-রকম মনে হ'তে পারে যে আমাদের চারিদিকে যে-সব গাছ-পালা পশু-পাখি-পোকা দেখতে পাই, তা-ই নিয়েই সমস্তটা পৃথিবী। কিন্তু সমুদ্রের নিচে যে কী বিশাল, রহস্যময় এক জগৎ চিরকাল আমাদের চোখের আড়ালে পড়ে' রয়েছে, তা ভাবলে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। তোমরা জানো যে পৃথিবীর তিনভাগই জল, নোনা জল—মানে, সমুদ্র। সমুদ্র যেখানে সবচেয়ে গভীর, সেখানে প্রায় পাঁচ মাইল

গভীর। সমুদ্রের একেবারে উপর থেকে প্রায় এক মাইল নিচে পর্যন্ত নানা রকমের অসংখ্য জীবের লীলা। তারও নীচে যে-সব প্রাণী, তারা এতই আশ্চর্য যে তাদের প্রাণী বলতে ইচ্ছা করে না। তারা জীবন্ত আলো, আর-কিছু নয়। তাদের কথা পরে বলছি।

সমুদ্রের প্রাণীরা ডাঙার জীবদের চাইতে কতটা বেশি জায়গা দখল করে' আছে, তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারবে। তার উপর, মাছেরা পাখি কি স্তন্যপায়ীর চাইতে অনেক, অনেকগুণ বেশি জন্মায়। আমরা যে-ইলিশ মাছের ডিম খাই, তার প্রত্যেকটা আলপিনের-মাথার-মত দানা[1] থেকে একটা মাছ হ'তে পারতো। এত ডিম, এত মাছ খাওয়া হয় (আর এটা মনে রাখবে যে ইলিশ মাছের ডিম অন্যান্য মাছেরও প্রিয় খাদ্য), তবু তো ছাখো, বাঙলাদেশের নদীতে ইলিশ মাছের শেষ নেই। আর সমুদ্রের মাছেদের মধ্যে অবিশ্রান্ত ভয়ঙ্কর খাওয়া-খাওয়ি চলছে। ছোট-বড় নির্বিশেষে সমুদ্রের জীবেদের অপরিসীম খাওয়ার ক্ষমতা ও অবিশ্বাস্য হিংস্রতা। মারো কি মরো, এই যেন জলের জঙ্গলের মূল কথা। দু' ইঞ্চি লম্বা মাছ তার দু' তিনগুণ বড় মাছকে আক্রমণ করতে ভয় করে না, এবং অনেক সময় নিরাপদে পেটের মধ্যে চালান করে'ও দেয়—এ-রকম ঘটনা এক সমুদ্রেই সম্ভব। এদের খিদে কখনো যেন মেটেই না। প্রত্যেক মাছ অন্য প্রত্যেককে খেতে প্রস্তুত ;-এবং আত্মরক্ষা ও আক্রমণের জন্য যে এদের কত-রকমের আলাদা কলকৌশল, তা ভাবলে প্রকৃতিকে বাহাদুর কারিগর বলতে হয় বটে।

এই ভীষণ খাওয়া-খাওয়ি, কামড়া-কামড়ি সত্ত্বেও সমুদ্রের জীবেদের উজাড় হয়ে যাওয়ার কোনো লক্ষণই নেই, কেননা বিপুল সংখ্যায় এরা জন্মায়। যত দূর পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছয়, সমুদ্রের প্রত্যেক কোণ-ঘুপচি প্রাণের অসংখ্য বিচিত্র আকারে

কিল্‌বিল্‌ করছে। তারও নিচে, যত দূর জানা গেছে, জানোয়ারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম—তাদের কথা পরে বলছি। মোট সংখ্যায়, ডাঙার জীবের চাইতে জলের জীব নিশ্চয়ই এত গুণ বেশি যে কোনো রকম তুলনাই হয় না। এক চামচে সমুদ্রের জল অণু-বীক্ষণের নিচে রাখলে তাতে দেখা যাবে অগুনতি পোকা—এত ছোট যে সাদা চোখে ধরা পড়ে না। সমুদ্রের অনেক সাধারণ মাছ (মানুষ যে-সব খায়) শুধু ঐ পোকা খেয়েই থাকে। সমুদ্রে প্রাণের অফুরন্ত বৈচিত্র্য। গাছ আর প্রাণীর মাঝামাঝি জীব থেকে (আমাদের নিত্য ব্যবহারের স্পঞ্জ যার একটা উদাহরণ) বিরাট তিমি পর্যন্ত সব রকম জীবেরই সেখানে ছড়াছড়ি।

'খুনে' তিমি

তিমি

আজ তিমির কথা বলি। এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে তিমি, মাছ নয়, স্তন্যপায়ী জন্তু। এবং বর্তমানে তিমির চেয়ে বৃহদাকার জন্তু পৃথিবীতে নেই। অ্যাটলান্টিক ও প্যাসিফিক মহাসাগর এর বিহারভূমি। বিশেষ করে', উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে তিমি খুব বেশি দেখা যায়। অবশ্যি জ্যান্ত এমন কি, মরা তিমি চোখে দেখবার সৌভাগ্য পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই হয়। বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে অনেক দেশেই তিমি মারা একটি প্রধান ব্যবসা। মেরু অভিযানে যাঁরা যান্ তাঁদেরও মাঝে-মাঝে তিমির সঙ্গে দেখাশোনা হ'য়ে থাকে। আমাদের অবিশ্যি ছবি দেখে এবং বই পড়েই তৃপ্ত থাকতে হবে। বড় জোর কলকাতার যাদুঘরে তিমির যে-কঙ্কাল আছে, সেটা তোমরা দেখে আসতে পারো। তাতে এই জানোয়ারের বিশাল আকার সম্বন্ধে খানিকটা অন্তত ধারণা হবে।

তিমি সাধারণতঃ জলের উপরকার স্তরেই থাকে, কিন্তু আত্ম-রক্ষার জন্য, কি অন্য বিশেষ কোনো কারণে সে এমন গভীর ডুব দিতে পারে, পৃথিবীর অন্য-কোনো জন্তুর পক্ষে যা সম্ভব নয়। এক ডুবে সে এক মাইল নিচে পর্যন্ত নামতে পারে—ভাবতে পারো! শরীরের উপর এক মাইল জলের চাপ যে কী ভয়ঙ্কর তা তোমরা ধারণা করতে পারবে না। আর সমুদ্রটা যেন বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা, এক এক স্তরে এক এক দল জানোয়ারের রাজত্ব। কম জলের জীব কোনো রকমেই গভীর জলে বাঁচতে পারে না, গভীর জলের জীব কোনো কারণে উপরে উঠে এলে তৎক্ষণাৎ মরে যাবে।

তিমির পক্ষে, তাই, এক মাইল জলের চাপ সহ্য করতে পারা একটা ভয়ানক কৃতিত্ব। একবার একটা তিমি হার্পুনের (harpoon —তিমি মারবার জন্য বল্লমের মত অস্ত্র) খোঁচা খেয়ে এমন নিদারুণ জোরে ডুব মারে যে জলের নিচের মাটিতে গিয়ে ঠেকে মাথার খুলির হাড় ভেঙ্গে ফেলে। আর কোনো রকমে একবার তলাকার মাটিতে গিয়ে ঠেকলে তিমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। বাতাসে সে নিঃশ্বাস নেয়, মাঝে-মাঝে নিঃশ্বাস নেবার জন্য জলের উপরে তাকে মুখ তুলতেই হয় এবং আবার ডুব দেবার আগে সে কয়েকবার ঘনঘন ঝড়ের মত বেগে নিঃশ্বাস নিয়ে নেয়।

বড় জাতের তিমির দাঁত থাকে না। দাঁতের বদলে উপরকার হাঁ থেকে ঝোলানো শিঙের মত এক রকম জিনিস থাকে, তাকেই Whalebone কি baleen বলে। ব্যবসার দিক থেকে এই ব্যালীন খুব মূল্যবান জিনিস। ব্যালীন আর তার গায়ের তেলের জন্যেই তিমি মারতে মানুষের এত উৎসাহ। 'ব্যালীন' তিমির স্বভাব অপেক্ষাকৃত নিরীহ—দাঁত না-থাকার জন্যেই। তার মুখে এই ব্যালীন জিনিসটা ঝাঁজরার মত ফুটো-ফুটো করা। এদের খাবার প্রণালীটা বড় চমৎকার। বিশাল গহ্বরের মত মুখ খুলে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে এরা ছুটে চলে, রাশি-রাশি জল মুখের মধ্যে গিয়ে ঢোকে। তারপর এরা মুখ বন্ধ করে' দেয়, ব্যালীনের ঝাঁঝরার ভিতর দিয়ে সমস্তটা জল ছুটে বেরিয়ে আসে, কিন্তু সেই জলের সঙ্গে অসংখ্য যে-সব ছোট-ছোট প্রাণী ঢুকেছিলো তারা আটকে যায়। বড় জানোয়ার এরা খেতে পারে না। চিংড়ি জাতীয় ছোট মাছ লক্ষ-লক্ষ খেয়ে এদের বিরাট শরীর পোষণ করতে হয়। বিখ্যাত গ্রীনল্যাণ্ড তিমি আর নীল তিমি (blue whale) এই জাতের। নীল তিমি লম্বায় একশো ফুটেরও বেশি পাওয়া গেছে। এই নীল তিমি সমস্ত জীবন্ত জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড় তো

বটেই, বোধ হয় পৃথিবীতে এত বড় জানোয়ার কোনোকালেও ছিলো না !

গ্রীনল্যাণ্ড-তিমির আর-এক নাম right whale। নীল তিমির চেয়ে ছোট হ'লেও, এরাও আকারে কিছু কম নয়—সত্তর আশি ফুট পর্যন্ত যায়। এদেরই whale bone সবচেয়ে বিখ্যাত এবং সেই বস্তুর লোভে মানুষ এদের মেরে-মেরে প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

দেঁতো তিমির মধ্যে সবচেয়ে বড় sperm whale। (এদের আর এক নাম ক্যাশালট—cachalot)। এরা পঞ্চাশ ষাট ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, দাঁতওয়ালা জানোয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড়। মস্ত পিপের মত মাথা এদের বিশেষত্ব। গরম দেশের সমুদ্রে এরা ঘুরে বেড়ায়, মেরুর কাছাকাছিও এদের দেখা যায়। এদের শুধু এক পাটি দাঁত—নিচের পাটি—কিন্তু সে-দাঁত মস্ত আর অসম্ভব তার জোর। অক্টোপাস জাতীয় জানোয়ার এদের প্রিয় খাদ্য। এরা ডুবুরের সেরা, এক ঘণ্টা পর্যন্ত ডুব দিয়ে থাকতে এদের কষ্ট হয় না। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র এরা চষে বেড়ায় খাদ্যের খোঁজে; ডুব দিয়ে থেকে অক্টোপাস শিকার করে। একবার একটা স্পার্ম-তিমির পেটের মধ্যে একটা অক্টোপাস পাওয়া গিয়েছিলো—শুঁড় (tentacle) নিয়ে সাতাশ ফুট লম্বা। গ্রীনল্যাণ্ড-তিমির মত মানুষ এদেরও মেরে-মেরে প্রায় শেষ করে' এনেছে—তার কারণ এদের গায়ের তেল খুব মূল্যবান।

আকারে অনেক ছোট, কিন্তু স্বভাবে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে গ্র্যাম্পাস-তিমি (Grampus)। এরা সত্যিকারের মাংসাশী—মানে মাছে এদের রুচি নেই। সীল প্রভৃতি সমুদ্রের অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তু ও পেঙ্গুইন পাখী এদের প্রধান খাদ্য। এরা এমন দুর্দান্ত হিংস্র যে এদের বলাই হয় খুনে-তিমি (Killer whale)। এরা

বড় জোর কুড়ি-তিরিশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, কিন্তু দল বেঁধে বিরাট ব্যালীনকে আক্রমণ করতেও এরা ভয় করে না। সব তিমিই দল বেঁধে চলে, কিন্তু এই খুনে তিমির ঝাঁক সমুদ্রের অন্য সব জন্তুর পক্ষেই একটা আতঙ্ক। দারুণ বেগে এরা চলে; দু'সারি ভয়ঙ্কর দাঁত দিয়ে যে কোনো শিকারকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে' ফেলে। বিশাল ব্যালীনকে মারবার এদের পদ্ধতিটা শোনো। দু'জন 'খুনে' দু'দিক থেকে ব্যালীনের নিচের হাঁ-টা জোর করে' টেনে ধরে, আর বাকি সবাই তার গায়ের উপর চড়ে' প্রকাণ্ড লম্বা লেজ দিয়ে প্রাণপণে বাড়ি মারতে থাকে। এই অত্যাচার চলতে থাকে, যতক্ষণ না ব্যালীন তার হাঁ খুলতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 'খুনে'র দল সেই বিশাল মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ে' জিভটাকে টেনে কামড়ে খেয়ে শেষ করে। আর তারপর বাকি ব্যালীনের কী অবস্থা হয় সহজেই বুঝতে পারো।

তারপর নিরীহ জলের পাখি পেঙ্গুইন শিকার করবারও এদের অদ্ভুত কায়দা। এদের গায়ের রঙ এত সাদা যে জলের মধ্যে চট্ করে' দেখা যায় না বলে এরা মস্ত সুবিধে পায়। কিন্তু খুব কাছে এসে পড়লে পেঙ্গুইনরা তাড়াতাড়ি জল ছেড়ে বরফের উপর উঠে আসে। তখন এরা শরীরের চাপ দিয়ে বরফ ভেঙ্গে ফেলে— যাতে পাখিগুলো ফের জলের মধ্যে পড়তে বাধ্য হয়।

হার্বার্ট জি, পন্টিং নামে এক ভদ্রলোক ক্যাপ্টেন স্কটের সঙ্গে তাঁর শেষ দক্ষিণ-মেরু অভিযানে যান। এই 'খুনে' তিমি সম্বন্ধে তাঁর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়। সেই গল্প তাঁর মুখ থেকেই তোমরা শোনো :

'আমাদের জাহাজ Great Ice Barrier এর কাছাকাছি আসতেই অনেকগুলো খুনে তিমি হঠাৎ জল থেকে মাথা তুলে নিঃশ্বাস ছাড়লে। পরের দিন রস্ দ্বীপের কাছাকাছি বিশাল তুষার

প্রান্তরের গা ঘেঁযে জাহাজ নোঙর করা হ'লো। একটু পরে, আমি যখন স্লেজে চড়ে' বরফের উপর দিয়ে রওনা হ'তে যাচ্ছি, হঠাৎ আটটা খুনে তিমি জাহাজের কাছে এসে ভীষণ জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস ছেড়ে আবার ডুবে গেলো।

আমি তাড়াতাড়ি ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—এদের ছবি তুলতেই হবে। বরফের প্রায় ধারে এসে দাঁড়িয়েছি এমন সময় হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম। আমার পায়ের নীচের বরফ হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলো, তারপর টুকরো-টুকরো হ'য়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেলো। আর তার তলা থেকে উঠে এলো আটটা 'খুনে', পাশাপাশি তাদের মাথা। একটার মাথা আমার থেকে দু'গজের বেশি দূরে হবে না।

আমি চমকে টলে' উঠলাম। কিন্তু আমার কপাল ভালো, সেই ধাক্কায় আমি পিছনে সরে' গেলাম। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লে আর রক্ষে ছিলো না। খুনেরা মাথা তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গুম্‌গুম্ শব্দ শোনা গেলো। প্রায় এক গজ পুরু বরফ পিঠের চাপ দিয়ে-দিয়ে ওরা ভেঙ্গে ফেলছে। তারপর আমার চারদিকে তুমুল তোলপাড় তুলে ওরা সেই বরফের টুকরোটাকে এমন প্রবলভাবে দোলাতে লাগলো যে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকাই আমার পক্ষে দায় হ'য়ে উঠলো।

তারপর সেই আটটা তিমি একসঙ্গে হাঁ করে' আমার দিকে এগিয়ে এলো। দূর থেকে আমি ক্যাপ্টেন স্কটের গলা শুনলুম, "লাফিয়ে এসো, শিগগির লাফিয়ে এসো, ছুটে চলে এসো।" কিন্তু কী করে' ছুটবো—আমার চার দিকে চল্লিশ গজ পর্যন্ত বরফ ভেঙে গেছে। আমি টুকরো থেকে টুকরোয় লাফিয়ে আসতে লাগলুম—আমার পায়ের নিচে তিমিগুলো জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে আর ভীষণ শব্দ করে' বরফের টুকরোগুলো উল্টিয়ে ফেলছে।

ভাঙা টুকরোগুলো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, আর দৃঢ় তুষারের সবচেয়ে কাছে এসে পৌঁছিয়েই আমাকে সব আশা ছাড়ত হ'লো। কেননা মাঝখানে এতটা ফাঁকা যে লাফ দিতে গেলেই নিশ্চিন্ত জলে পড়বো।

তারপর একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটলো। স্রোতের ঠেলায় কি তিমিদের তোলপাড়ের ধাক্কায়, যে-টুকরোটার উপর আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম তা কাছে সরে' এলো—এক লাফে আমি নিরাপদ দৃঢ় তুষারে উঠে এলুম। আর এক মুহূর্ত দেরি হ'লেও রক্ষে ছিলো না। পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, ঠিক যেখানটায় আমি লাফ দিয়েছিলুম, সেখান থেকে প্রকাণ্ড কালো একটা মাথা উঠে আসছে। খুলে গেলো বিশাল হাঁ, দেখলুম তার ভয়ঙ্কর দাঁতের সারি। এক-এক করে' সবগুলো তিমিই মাথা তুলে মুখ খুলে দেখালো তাদের ভয়ঙ্কর দাঁত। আমার কী হ'লো, যেন তা-ই দেখতে চায়। কিন্তু আমি তখন সব বিপদের বাইরে।'

ক্যাপ্টেন স্কট এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন। 'এটা অবিশ্যি আমরা সবাই জানতুম যে খুনে-তিমিরা তুষার প্রান্তরের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়—যদি কারো সেখান থেকে জলের মধ্যে পড়ে' যাওয়ার দুর্ভাগ্য হয় তাকে তৎক্ষণাৎ লুফে নেবে। কিন্তু ওদের যে এত দূর দল-বাধা ধূর্ততা থাকতে পারে, আর অত মোটা বরফ শরীরের চাপে ভাঙবার ক্ষমতা যে এদের আছে—এটা আমাদের নতুন শিক্ষা হ'লো।'

অক্টোপাস

অক্টোপাস

তিমি কি হাঙর যত ভয়ঙ্করই হোক, নিছক বীভৎসতায় অক্টোপাসের তুলনা হয় না। সমুদ্রের এই জীবন্ত আতঙ্কের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, এবং মোটামুটি এর চেহারার রকমটা জানো। যে-সব জন্তুর কথা ভাবলেই গা-টা কেমন শিরশির করে' ওঠে. অক্টোপাসের স্থান তাদের মধ্যে সবার উপরে। অনেক লোক আছে মাকড়সা দেখলেই ভয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—যদিও মানুষের মাকড়সাকে ভয় করবার কোনো কারণ নেই। ভয়টা হয় ঐ লিক্‌লিকে, কিল্‌বিলে চেহারার জন্যে। আর অক্টোপাসের চেহারা সেই ভয়ের চরম মূর্তি।

অক্টোপাসকে বাঙলায় বলা যায় 'অষ্টপদী'—যার আটটা পা আছে। হাতই বলো আর পা-ই বলো আর শুঁড়ই বলো—এই আটটা লম্বা লম্বা জিনিস দিয়ে ওরা শিকারকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। আটটা শুঁড় খুব পাতলা চামড়া (membrane) দিয়ে জোড়া লাগানো—অনেকটা ছাতার শিকের মত। প্রত্যেকটা শুঁড়ের সঙ্গে থাকে অসংখ্য sucker, এবং প্রত্যেকটা sucker দশ সের পর্যন্ত ওজন টেনে তুলতে পারে। শিকারের মাংস ছিঁড়ে মুখে তোলবার ব্যবস্থা অক্টোপাস এই রকম করে' করে। এই 'শোষক'-যন্ত্রটা অনেকটা বাঁকানো হুক গোছের, যার সাহায্যে খুব শক্ত করে' আঁকড়ে ধরা যায়। ভাবলে অবাক হ'য়ে যেতে হয় যে কোনো-কোনো অক্টোপাসের প্রত্যেকটা শুঁড়ে তিনশো পর্যন্ত sucker পাওয়া গেছে!

অক্টোপাস আসলে মাছ নয়—mollusc নামে অন্য এক

জাতের জানোয়ার। নিরীহ শামুক ঝিনুকও এই মোলাস্‌ক্‌ জাতের শুনলে তোমরা বোধহয় অবাক হবে। কাট্‌ল্‌ফিস, অক্টোপাস প্রভৃতি বৃহদাকার মোলাস্‌ক্‌-এর অবিশ্যি বাইরে খোলস থাকে না—এরা মোলাস্‌ক্‌-এর মধ্যে উঁচু জাতের। ছোট জাতের মোলাস্‌ক্‌ অত্যন্ত নিরীহ, যুদ্ধ কাকে বলে জানেই না ; কিন্তু প্রত্যেক 'বাহু'তে অসংখ্য sucker নিয়ে অক্টোপাস যে মহাযোদ্ধা হবে তা সহজেই বোঝা যায়। এই ভয়াবহ জানোয়ারটির প্রিয় খাদ্য হচ্ছে কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ি। সমুদ্র যেখানে খুব গভীর নয়, তার তলাকার মাটিতে পাথরের আড়ালে ওত পেতে এ বসে' থাকে—কাঁকড়া কি গলদা চিংড়ি কাছাকাছি এসে পড়লেই লম্বা শুঁড় বাড়িয়ে টপ্‌ করে ধরে' ফেলে। তাই বলে' ভেবো না যেন, কাঁকড়া-চিংড়ি খেয়েই এ খুশি থাকে। বড় বড় জানোয়ার আক্রমণ করতে এর কিছুমাত্র কুণ্ঠা নেই, এবং নিজেদের মধ্যে মারামারি তো অবিশ্রান্ত চলেছে। বিরাট তিমিদের গায়ে প্রায়ই জখমের দাগ দেখা যায়—সেটা অক্টোপাসের কি তাদের জাত কাটল্‌ ফিশের কীর্তি। তিমির গা থেকে হামেশাই এরা মাংস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায়। ইয়োরোপের সমুদ্রে যে-সব অক্টোপাস পাওয়া যায় তাদের শুঁড় সাধারণত দু'ফুটের বেশি লম্বা হয় না ; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে চল্লিশ ফুট বেড়ের অক্টোপাসও পাওয়া গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং জাপানের কাছাকাছি সমুদ্রে বড় অক্টোপাসে জেলেদের নৌকো অনেক সময়ে উলটে দেয় বলে শোনা গেছে।
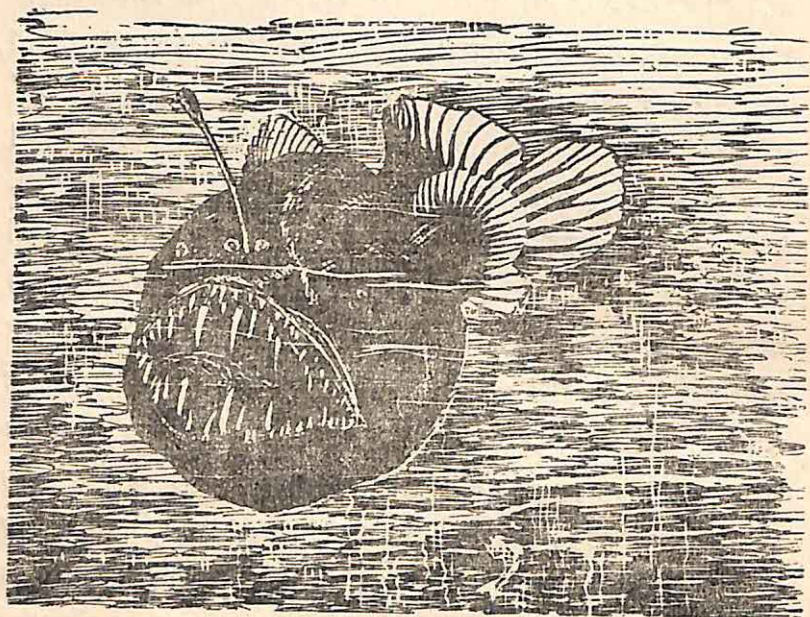
গভীর সমুদ্রের শয়তান মাছ

গভীর জলের জীব

কিন্তু বিশাল সমুদ্র-সর্প যদি গল্প কথাও হয় তবু সমুদ্রের ভয়ঙ্কর রহস্য কিছুমাত্র কমে না। সামুদ্রিক-সর্পকে বাদ দিয়েও সমুদ্রে অনেক কিছু আছে—এমন ভয়ঙ্কর এমন অদ্ভুত সব জানোয়ার আছে, যাদের কথা সহজে বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। লোকে বড় কিছু, কল্পনাতীত কিছুর কথা বলতে গেলেই সমুদ্রের তুলনা দেয়। যেমন বলে বিদ্যার সাগর। তুলনাটা মোটেই ভুল নয়। কারণ সমুদ্র সত্যিই কল্পনাতীত ;—বিশেষ করে আমাদের ডাঙ্গার জীবের কল্পনাতীত। সমুদ্রের আমরা কতটুকু রহস্যের সন্ধান পেয়েছি! ভেবে দেখো পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ হল সমুদ্র। সেই সমুদ্রের জলের ওপর দিয়ে মাত্র আমরা জাহাজে যাতায়াত করি, কখন কখন সাবমেরিনে ডুবেও যাই, কোথাও কোথাও খানিক দূর পর্যন্ত ডুব দিয়েও দেখি, কিন্তু তাতে আর সমুদ্রের কতটুকু জানা যায়। পৃথিবীর তিনভাগের একভাগ যে স্থল তারই কত জানোয়ার এখনো পর্যন্ত অজানা। সুতরাং সমুদ্র যে আরও কতখানি আমাদের অজ্ঞাত তা বুঝতেই পার। সমুদ্রের ওপরের জলই ত কত রকম। বিষুবরেখার কাছাকাছি গরম সমুদ্র, দুই মেরুর নিকটের ঠাণ্ডা জমানো বরফের সমুদ্র থেকে আলাদা, মাঝে আবার না-গরম না-ঠাণ্ডা সমুদ্র আছে। সমুদ্রের নানা জায়গায় নানা রকম প্রাণী। আবার শুধু তাই নয় সমুদ্রের আবার স্তর-ভেদ আছে, ওপরকার জলে সে সব জানোয়ার থাকে তার কিছু নিচের জানোয়ার থেকে আলাদা। যত নীচে যাওয়া যাবে তত প্রাণীজগতের পরিবর্তন দেখা যাবে।

সুতরাং একই জায়গায় স্তর ভেদে নানা রকম প্রাণী পাওয়া যায়।

খুব গভীর সমুদ্রের প্রাণীর কথা আমরা কিছুদিন হল সামান্য সামান্য জানতে পেরেছি। এখনো সেখানে অনুসন্ধান করবার অনেক কিছু আছে। তোমরা বোধ হয় বুঝতেই পারছ সূর্যের আলো সমুদ্রের খানিক দূরের বেশী আর পৌঁছায় না। সূর্যের আলো যেখানে শেষ হল সেখান থেকে আরম্ভ অন্ধকার ঠাণ্ডা জলের রাজ্যের। সে রাজ্য ভীষণ ; অতি বড় দুঃস্বপ্নে আমরা যা দেখতে পাই না তেমনি সব জানোয়ার সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্ধকারে। তাদের ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্য শিকার খোঁজা আর আততায়ীর হাত থেকে পালান। আর কোন কাজ সেখানে নেই। সকলেই সকলকে শিকার করে ফিরছে আর বিপদে পড়লে পালাচ্ছে। পুঁচকে একটি জানোয়ার সেখানে তার পাঁচ ছ গুণ বড় একটা প্রাণীকে আক্রমণ করে গলাধঃকরণ করতে দ্বিধা করে না। কারণ সেখানে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে অপরকে মারা।

এই যে জলের রাজ্যের কথা বলছি এ হচ্ছে সমুদ্রের নীচে ৬০০ থেকে ২০০০০ হাজার ফিট পর্যন্ত। এ রাজ্য অমাবস্যার রাতের চেয়েও অন্ধকার তোমাদের আগেই বলেছি। তোমরা ভাবছ নিশ্চয়ই, এ অন্ধকারে সেখানকার প্রাণীরা পরস্পরকে শিকার করে কি করে! তারা অন্ধকারে দেখে কি করে?

তার উপায় সেখানকার প্রাণীরা উদ্ভাবন করেছে বই কি! উপায় দু-রকম। সেখানকার অনেক বিকটাকার মাছেদের নিজেদের গা থেকেই আলো বেরোয়। পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে এক রকম মাছ আছে যার নাম শয়তান মাছ। চার হাজার ফিটের নীচে অন্ধকার জলে এরা বিচরণ করে। এদের চেহারা আর দাঁত দেখলেই বুঝতে পারবে শয়তান নাম এদের সার্থক। এদের গা

থেকে বেরোয় এক রকম ঠাণ্ডা উজ্জ্বল আলো। সেই আলোয় এরা নিজেদের পথ করে নেয়। আরেক রকম মাছ এখানে পাওয়া যায় যার নাম ছিপ-মাছ দেওয়া যেতে পারে। এদের মাথার ওপর থেকে ছিপের মত একটা ডাঁটি বেরোয়। ডগায় জ্বলে আলো। সে আলো আবার তারা নাকি ইচ্ছামত জ্বালতে বা নিভোতে পারে। সেই আলোর টোপ দেখিয়েই তারা অন্য মাছ শিকার করে। একবার কোন বোকা মাছ সে আলোর লোভে কাছে এলেই হল। ছিপ-মাছের প্রকাণ্ড মুখের ধারাল দাঁত তাকে জম্পেস করে ধরে ফেলবে। একবার ধরলে আর ছাড়ান-ছিড়েন নেই। ধীরে ধীরে ছিপ-মাছ তাকে গিলে ফেলবেই। কোন কোন সময়ে ছিপ-মাছ নিজেই যে বিপদে পড়ে না তা নয়। বেপরোয়া ভাবে হয়ত নিজের চেয়ে অনেক বড় মাছকে সে ধরে কামড়ে। তারপর বড় মাছ যখন সাঁতরে ওপর দিকে ঠেলে ওঠে তখন একটু একটু করে গিলতে গিলতে ছিপ-মাছও বাধ্য হয়ে ওপরে ওঠে। কিন্তু মাছেদের নিজের এলাকা ছাড়িয়ে ওপরে ওঠা বড় বিপদের কথা। জলের চাপ কমবার সঙ্গে সঙ্গে মাছের দেহ ক্রমশঃ ফুলে ফেঁপে ওঠে। শেষকালে অতিরিক্ত ফোলান বেলুনের মত ফেঁপে গিয়ে ছিপ-মাছ শত্রুকে গলাধঃকরণ করেও অসহায় ভাবে মারা পড়ে। সমুদ্রের এই গভীরতায় শুধু মাছ নয় পোকামাকড় নানা প্রাণীর গা থেকেই আলো বেরোয়। এক রকম চিংড়ি আছে তারা ত বিপদে পড়লে তরল আগুনের মত এক রকম উজ্জ্বল জলের ধোঁয়া ছেড়ে শত্রুকে ভড়কে দিয়ে পিটটান দেয়। হাজার নয়েক ফিটের মধ্যে এক রকম হাঙ্গর ঘুরে বেড়ায় তাদেরও গা-এর চামড়া থেকে আলো বেরোয়।

কিন্তু এ ছাড়াও অন্ধকারে নিজেদের কাজ চালাবার আর এক উপায় এখানকার কোন কোন প্রাণীরা অবলম্বন করেছে। এখান

কার অনেক মাছের চোখ একদম নেই। অন্ধকারে প্রয়োজনের অভাবে তাদের চোখ ক্রমশঃ নষ্ট হয়ে গেছে। এই সব অন্ধ প্রাণীদের গা দিয়ে আলো বার হলেও কিছু সুবিধা যে হবে না, তা বোধ হয় বলাই বাহুল্য। কিন্তু নাই বা বেরুল আলো। প্রকৃতির উদ্ভাবনী শক্তির ত' আর শেষ নেই। এই সব অন্ধ মাছদের মাথা থেকে সরু লিকলিকে চাবুকের মত দু-ধারে লম্বা দুটো জিনিস বেরিয়েছে। এইগুলোই এদের অন্ধের নড়ি। এই চাবুক চারিধারের জলে খেলাতে খেলাতে এরা চলাফেরা করে। সেই চাবুক দিয়ে স্পর্শ করে তারা শত্রু-মিত্রের সন্ধান নেয়। চোখের বদলে চাবুক পেয়ে এদের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না।

এই যে গভীর সমুদ্রের অন্ধকার রাজ্য এর কথা জানবার জন্যে মানুষকে কম বুদ্ধি, কম পরিশ্রম, কম দুঃসাহস করতে হয়নি। সেদিন পর্যন্ত এই রাজ্য ত ছিল মানুষের অজানা। মানুষ তখন পর্যন্ত আঠার শ ফিটের নীচে কখন নামতে পারেনি। যে সমুদ্র কোন কোন জায়গায় পাঁচ মাইলেরও বেশী গভীর, তার তলার কথা কিছুই সে দিন জানা ছিল না। জানবার উপায় ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে উপায় বেরিয়েছে। সমুদ্রের নীচের জিনিস ছেঁকে তোলবার জন্য নানা রকম টানা জাল উদ্ভাবিত হয়েছে। মানুষ শুধু জাল দিয়ে ছেঁকে তুলেই সন্তুষ্ট হয় নি। সমুদ্রের তলায় নেমে স্বচক্ষে সেখানকার রহস্য দেখবার জন্যে সে নানা রকম যন্ত্রপাতি তৈরী করেছে। সমুদ্রের নীচে যাঁরা নিজেরা নেমে সেখানকার ব্যাপার দেখেছেন তাঁদের মধ্যে আমেরিকার প্রাণী-তত্ত্ববিদ্ উইলিয়াম্ বীব (William Bebe) বিশেষ বিখ্যাত। তাঁর মত অত গভীর জলে আর কেউ নামতে পারেনি। অনেক রকম অজানা অদ্ভুত গভীর জলের প্রাণীও তিনি সংগ্রহ করেছেন কিন্তু

এখনও আরও অনেক কিছু জানবার আছে—২৩০০০ ফিটের নীচে থেকে কোন প্রাণী, মানুষ এখনো টেনে তুলতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা উচিত নয়, যে তার নীচে আর কোন-রকম প্রাণী নেই।
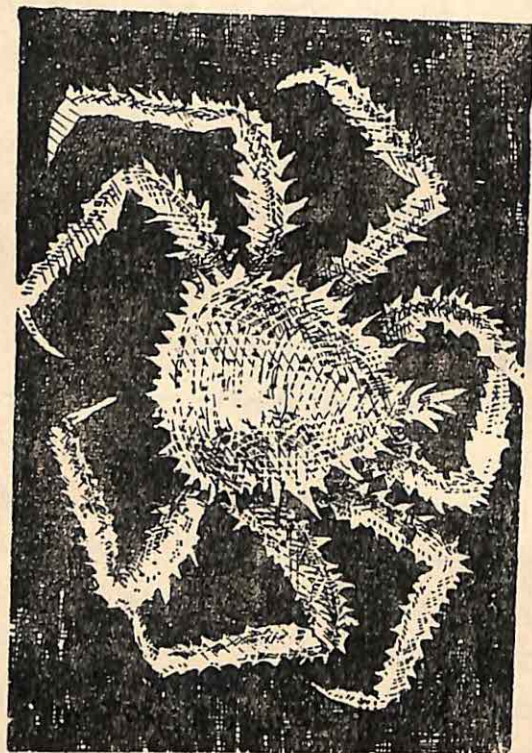
কাঁটাওয়ালা সামুদ্রিক কাঁকড়া

জলের জঙ্গল

এ তো গভীর সমুদ্রের কথা গেল—যেখানে জল নিয়তই বরফের মত ঠাণ্ডা, যেখানে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, এবং জলের চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে একশ মনেরও কোথাও কোথাও বেশী। এ ছাড়া ওপরের সমুদ্রেরও বৈচিত্র্যের সীমা নেই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সর্বপ্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল সমুদ্রে। সমুদ্রেই প্রাণের প্রথম বিকাশ হয়, তারপর সেখান থেকেই নানান রূপে নানা ধারায় প্রাণের স্রোত বয়ে গেছে বলা যেতে পারে। জীবন্ত প্রাণী যত রকমের হতে পারে, তার মধ্যে মাত্র কয়েক রকম ডাঙায় তারপর উঠতে পেরেছে। কিন্তু বেশীর ভাগই সমুদ্র পরিত্যাগ করেনি বা করতে পারেনি। সুতরাং সমুদ্রে বৈচিত্র্য ডাঙার চেয়ে বেশী ত হবেই।

সমুদ্রের আর একটা মজা হচ্ছে, এই যে, সেখানে আমাদের ডাঙার গাছের ধরনের কোন কিছু নেই বল্লেই হয়। পৃথিবীর জঙ্গল বলতে প্রথমেই মনে পড়ে বড় ছোট নানা রকম গাছের জটলার কথা। কিন্তু সমুদ্রে সে রকম কিছু নেই। অগভীর সমুদ্রের তলাতে ঠিক ডাঙার মতই জঙ্গল দেখা যায় বটে, কিন্তু গাছ বলে যা মনে হয়, সেগুলি সবই কোন না কোন রকমের জানোয়ার। গাছের মত তারা মাটি থেকে শিকড় দিয়ে রস নিয় সূর্যের আলোকের সাহায্যে তা পরিপাক করে না। জানোয়ারের মত তারা অন্য প্রাণী ধরে খায়। সমুদ্রে গাছের মত এক রকম জিনিস আছ তার নাম প্ল্যাঙ্কটন, কিন্তু সেগুলি অণুবীক্ষণ ছাড়া দেখা যায় না। সূর্যের আলো যত দূর পর্যন্ত পৌছোয়, তত দূর পর্যন্ত এই

অণুবীক্ষণিক প্ল্যাঙ্কটন জলের সঙ্গে মিশে থাকে। এই প্ল্যাঙ্কটন ছাড়া সমুদ্রে আর সব প্রাণী, তারা পরস্পরকে আহার করে জীবন-ধারণ করে।

পুরীর সমুদ্র তোমরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই দেখেছ। সেই সমুদ্রতীর থেকে ডুবুরীর পোশাক পরে যদি তোমরা নেমে যেতে পারতে ক্রমশঃ জলের নীচে, তাহ'লে কি দেখতে পেতে জান? খানিকদূর নামতে না নামতেই দেখতে অদ্ভুত জলের জঙ্গল। তোমাদের মনে হ'ত অদ্ভুত আকারের সব গাছ জলের ভেতর বেড়ে উঠে ঘন ঝোপ গড়ে তুলেছে। কিন্তু আগেই বলেছি ওগুলি গাছ নয়। গাছের মত ওদের না আছে শেকড়, না আছে সূর্য থেকে আলো নেবার জন্যে সবুজ পাতা। তারাও এক রকমের প্রাণী, তাদের ভেতরটা ফাঁপা—সমস্তই ফাঁপা পেট। তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে আটকে আছে বটে, কিন্তু শিকার খুঁজছে নানা উপায়ে। কারুর গায়ে মনে হবে রঙীন অপরূপ ফুল ফুটে আছে। কিন্তু আসলে তা ফুল নয়, শিকার ধরার এক রকম ফাঁদ। কোন প্রাণী সেই ফুলের কাছে ঘেঁষবা মাত্র সে ফুল হিংস্র ভাবে তাকে গ্রাস করবে। কারুর আছে স্প্রিং দেওয়া এক রকম চাবুক, শিকারকে বাগে পেয়ে হঠাৎ চাবুক মেরে অবশ করে ফেলাই তার উদ্দেশ্য। কেউ বা আরেক উপায়ে জলের ভেতর মৃদু স্রোত তৈরী করে ভেতরে টেনে নিচ্ছে। সেই স্রোতে ছোট-খাটো প্রাণীরা অসহায় ভাবে গিয়ে পড়ছে তার পেটের মধ্যে।

এই প্রাণীর জঙ্গলে দেখবে বিচিত্র আকারের বিচিত্র বর্ণের কাঁকড়া, চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ প্রভৃতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কড়ি, শামুক, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি নড়ছে ধীরে ধীরে। সে সব ঝিনুক ও শঙ্খের আকার নিখুঁত ভাবে শিল্পীর হাতে তৈরী বলে মনে হয়। কি বিচিত্র তাদের রূপ! কি অপরূপ বর্ণ বিন্যাস! আমাদের

শুভ কাজে যে শঙ্খ বাজে, যে কড়ি নিয়ে আমরা খেলি, সেগুলি সেই সব প্রাণীর বাইরের খোলস ছাড়া আর কিছু নয়। নরম কাদার ওপর পাঁচ পায়ে এদিকে ওদিকে ফিরছে তারামাছ। এই তারামাছ এক অদ্ভুত জানোয়ার। আসলে এ মাছ নয় এবং এর পাগুলিও ঠিক আমাদের মত পা নয়, এদের মাথার দিক বা পায়ের দিক বলে কিছুই নেই। সব দিকই এদের সমান। নীচের দিকে এদের মুখ, আর পাঁচটি পা এদের পেট। মুখ থেকে খাবার গিয়ে এই 'পায়ের' ভেতর এদের হজম হয়।

হাঙরের জ্ঞাতিগোষ্ঠী

কিন্তু এদের কথা এখন থাক, এখানে আরো এমন সব বিচিত্র প্রাণী আছে, যাদের কথা বলতে গেলে মহাভারতেও কুলোয় না। এর পরে তাদের কথা তোমরা পড়বে। এখানকার বড় বড় প্রাণীর কথাই বলি। এই জঙ্গলেই ঘুরে বেড়ায় হাঙ্গরের এক জ্ঞাতি। তার নাম শঙ্কর মাছ। শঙ্কর মাছের চাবুক তোমরা হয়ত দেখেছ। সে চাবুক এই মাছের লেজ থেকে তৈরী। এই কাঁটা-ওয়ালা লেজের একটি ঘা খেলে আর দেখতে হবে না। চামড়া কেটে দাক্‌ড়া দাক্‌ড়া ঘা হয়ে যাবে। কোন কোন শঙ্কর মাছের চাবুকে আবার বৈদ্যুতিক 'শক্' দেবার ক্ষমতা আছে। খুব বড় জাতের শঙ্কর মাছ আমাদের বঙ্গোপসাগরেই দেখা যায়। তাদের কারুর কারুর ওজন দু টনেরও বেশী,—আর চেহারা? সে চেহারা এমন ভীষণ যে অতি বড় দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাও হার মানে। শঙ্কর মাছ দেখতে চ্যাপ্টা ও চওড়া, আর এদের ডানা পাখীর ডানার মত। এরা সাধারণতঃ গভীর জলে থাকে না। সমুদ্র তীরের কাছাকাছি শামুক, ঝিনুকের বসতির ওপরই এদের পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঝিনুক জাতীয় প্রাণী এদের প্রধান খাদ্য। এদের মুখের শক্ত দাঁতে এরা ঝিনুকের অত্যন্ত শক্ত খোলসও অনায়াসে গুঁড়ো করে ফেলে। সমুদ্রের ধারের জেলেরা এই শঙ্কর মাছের দ্বারা অনেক সময়ে বিপন্ন হয়। এই শঙ্কর মাছেরই এক ভাই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের কাছে ঘুরে বেড়ায়। সেখানকার ডুবুরীরা একে যমের চেয়ে বেশী ভয় করে। তারা এর নাম দিয়েছে সাগর-বাদুড়। প্রকাণ্ড ডানার জন্যে এই মাছকে জলের ভেতর অনেকটা অতিকায় বাদুড়ের মত

দেখায়। মুক্তোর জন্যে ঝিনুক সংগ্রহ করতে যারা ডুবুরীর কাজ করে তারা অনেক সময়ে এই সাগর-বাদুড়ের হাতেই প্রাণ দেয়।

কিন্তু দাদারও দাদা আছে। এই ভয়ঙ্কর শঙ্কর মাছের যম হল বঙ্গোপসাগরের আরেক বিভীষিকা'—হাতুড়ি-মাথা-হাঙ্গর। এদের মাথাটা হাতুড়ির মত চওড়া হয়ে গেছে দুধারে। সেই হাতুড়ি-মাথার দুই ধারে দুটি চোখ। সব সুদ্ধ জড়িয়ে এই জানোয়ারটিকেও দেখতে ভীষণ। এদের নাকি শঙ্কর মাছেই সবচেয়ে বেশী রুচি। শঙ্কর মাছের লেজের ওই দারুণ চাবুককে এরা থোড়াই কেয়ার করে।

ডুবুরীর পোশাক পরে সমুদ্রের নীচে নেমে সেখানকার দৃশ্য দেখবার কথা বলছিলাম, কিন্তু অনেক দৃশ্য আছে, ডুবুরীর পোশাকে যা দেখতে পাওয়া সম্ভব হলেও একান্ত বিপজ্জনক। কোন অলৌকিক উপায়ে অশরীরী হয়ে যদি আমরা জলের ভেতর ঘুরে বেড়াতে পারতাম, তাহলে কি সব বিস্ময়কর জিনিসই না আমাদের চোখে পড়ত! এই বঙ্গোপসাগরের জলেই হয়ত কোথাও আমাদের দেখা হয়ে যেত আরেক অদ্ভূত মাছের সঙ্গে। মাথার দিকটা এদের করাতের মত লম্বা ও ধারাল হয়ে বেড়ে গেছে। মাছটি আকারে কুড়ি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়, তাদের করাতটির মাপই ছয় ফুট। করাতের গোড়ার দিকটা প্রায় এক ফুট চওড়া, আর সেই করাতের দু'ধার কাটাকাটা। এই করাতের এক বাড়িতেই অনেক হতভাগ্য জেলের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে বলে শোনা গেছে। অন্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল মাছের ঝাঁকের ভেতর করাত-মাছ পাশাপাশি ভাবে তা'র অস্ত্র চালায়, আর সেই অস্ত্রের আঘাতে বহু মাছ আহত হয়ে অকর্মণ্য হলে তাদের আহার করে। শুধু যে দুর্বল মাছের ঝাঁককেই করাত-মাছ আক্রমণ করে তা নয়, বিশালকায় তিমি শিকার করতেও এরা পটু। বিশাল তিমির তলায় গিয়ে

ঢুঁ মেরে এরা অনেক সময়ে তার নরম চর্বিওয়ালা মাংস ভেদ করে একেবারে হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত করাত চালিয়ে দেয়। তিমির তাইতেই দফা রফা। করাত মাছ আর তলোয়ার মাছ কিন্তু এক জিনিস নয়। তরোয়াল মাছ ঠিক হাঙরের জ্ঞাতির মধ্যে পড়ে না। আকারেও তারা ছোট। কিন্তু ভীষণতায় দুজনের মধ্যে কে বড় বলা কঠিন। তলোয়ার মাছকে 'বেয়নেট' মাছ বল্লেই বোধহয় ভাল হয়। মাথার এই অস্ত্র ঠিক বেয়নেটের মতই চালিয়ে এরা বিদ্যুদ্বেগে আততায়ীকে আক্রমণ করে। এরা ভয়ানক রগচটা; অকারণে চটে গিয়ে এরা অনেক সময়ে জাহাজের তলায় পর্যন্ত ঢুঁ মারে। তাদের মাথার তরোয়ালের ফলা, জাহাজের তক্তা অনেক সময় প্রায় দু ফুট পর্যন্ত ভেদ করে ফেলে। জাহাজ আক্রমণ করে কিন্তু এদের নিরস্ত্র হয়েই ফিরতে হয়। তরোয়ালের ফলা কাঠেই আটকে থাকে।

সীল

কিন্তু সমুদ্রের হিংস্র ও বড় বড় জানোয়ার সবই মাছ নয়। তিমির কথা তোমাদের আগেই বলা হয়েছে। তিমিকে যে ভুল করে মাছ বলা হয় তা তোমরা জান। তিমি ছাড়া আরও অনেক সমুদ্রের জানোয়ার আছে, যারা মোটেই মাছ নয়। মাছের মত এরা জল থেকে কানকোর সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করে না, এদের ডিম থেকেও ছানা হয় না। ডাঙার প্রাণীর মত এরা নিঃশ্বাস নেয় বাতাস থেকে। এরা স্তন্যপায়ী ;—এদের রক্ত আমাদের মত গরম। এরা জলে সাঁতার কাটে বটে পাখনার মত জিনিস দিয়ে, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে পাখনা আমাদের এই পাঁচ আঙ্গুলওয়ালা হাত পায়েরই রূপান্তর। এদের দেহের সঙ্গে ডাঙার স্তন্যপায়ী জন্তুর দেহের কোন গভীর তফাত নেই। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ সমুদ্রের এ সমস্ত জানোয়ারের সঙ্গে ডাঙার প্রাণীর এত মিল কেন ? মিল হবার কারণ এই যে, এই সমস্ত প্রাণী এককালে ডাঙায় বাস করত আমাদেরই মত। তারপর বহুকাল আগে পৃথিবীতে অন্যান্য জানোয়ারের প্রতিযোগিতায় হেরে হোক বা সমুদ্রের সুবিধার জন্যই হোক এরা সমুদ্রে নেমে গেছল ডাঙা থেকে। এক হিসাবে একে যাওয়া নয় ফিরে যাওয়া বলতে পারো। কারণ ডাঙার সব প্রাণীই একদিন সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল। তারই মধ্যে কয়েকটি আবার গেল সমুদ্রে ফিরে। কিন্তু ফিরে গিয়ে এদের সুবিধে হল অনেক বেশী। ডাঙায় বহুকাল থাকার দরুন সেখানকার প্রতিযোগিতায় এদের বুদ্ধি বেড়ে গেছে। মাথা হয়েছে সাফ্। সমুদ্রে যারা চিরকাল ধরে আছে, প্রত্যাবৃত্ত

দল তাদের সব দিকেই হটিয়ে দিলে। সমুদ্র কেন, সমস্ত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে শক্তিমান প্রাণী হ'ল তিমি—কোন মাছ বা অক্টোপাস নয়।

যে সমস্ত জানোয়ার এই রকম ভাবে স্থল থেকে জলে নেমে গেছে, তাদের মধ্যে তিমির বংশই বড়। শুশুক, ডুগং প্রভৃতি প্রাণী, এই তিমিরই দূর ও নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি। বাইরে থেকে দেখলে এরা মাছেরই মত এবং সেই জন্যেই বহুদিন পর্যন্ত লোকে তিমিকে মাছ বলে ভুল করেছে।

তিমি ছাড়া আর এক দল স্থলের জানোয়ার জলে বাসা বদলেছে। এরা হ'ল সীল মাছের বংশ। সীলকে কিন্তু মাছ বলে ভুল করার কোন কারণ নেই। জলে সাঁতার কাটবার পাখাগুলি ছাড়া এদের শরীরের অন্যান্য সমস্ত অংশ বেশ স্পষ্টই ডাঙার প্রাণীর মত। তার কারণ এই যে সীল মাছের বংশ তিমিদের তুলনায় সমুদ্রে নতুন এসেছে। বৈজ্ঞানিকেরা নানা প্রাচীন কঙ্কাল ও সীল মাছের গড়ন ইত্যাদি পরীক্ষা করে জেনেছেন যে পৃথিবীতে বাঘ সিংহ প্রভৃতি শ্বাপদ আবির্ভূত হবার আগে, সীলেরাই রাজত্ব করত হিংস্র প্রাণী হিসেবে। তারপর ঠিক কি কারণে বলা যায় না, তারা স্থল ছেড়ে জলেই নেমে যায়। এরা এখনো কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে 'জলীয়' হতে পারেনি। তিমি কোন রকমে ডাঙায় আটকা পড়লে মারা পড়ে। আর সীলেরা নিজেরা শখ্ করে ডাঙায় আসে রোদ পোহাতে। স্থলে এরা ডাঙার প্রাণীর মত ক্ষিপ্র না হলেও চলতে পারে কোন রকমে পাখনা ঘষড়ে, কিন্তু তিমি স্থলের ওপর একেবারে অথর্ব। তিমির শরীরের গঠন ক্রমশঃ বদলে গিয়ে শুধু জলের উপযোগী হয়েছে। সীলেরা এখনও অতটা হবার সময় পায়নি বলা যেতে পারে।

সীল প্রধানতঃ দু'জাতের। আসল সীল মাছ যাদের বলা হয়

তাদের কান একদম লোপ পেয়েছে। এই জাতের সীল জলেই সাধারণতঃ থাকে এবং এদের দেহ তারই বিশেষ উপযোগী হয়ে উঠেছে। এদের পেছনের দুটি পা মাছের লেজের অনুকরণে বেঁকে গেছে। সে পা এরা আর ডাঙায় উঠেও সামনে আনতে পারে না। হাতী-সীল যাদের বলা হয়, তারা এই আসল সীলেদের একটি শাখা। আকারে এরা প্রায় বারো ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের পুরুষদের নাকের ওপর শুঁড়ের মত খানিকটা মাংস বাড়ে বলেই এদের হাতী নাম দেওয়া হয়েছে। আসল সীল পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই এখনো দেখা যায়। শুধু সমুদ্রে নয়, ডাঙায়-ঘেরা পৃথিবীর অনেক বিশাল হ্রদেও সীলমাছের আড্ডা। ক্যাসপিয়ান সাগর, এশিয়ার বৈকাল হ্রদ প্রভৃতিতেও সীল মাছ আছে। অবশ্য দুই মেরুতেই এদের প্রধান আড্ডা। সেখানকার বরফের ওপর এদের বাচ্চা হয় এবং সেইখান থেকেই সীল মায়েরা বাচ্চাদের সাঁতার শেখায়। জলের জানোয়ারকে সাঁতার শেখাবার কথা শুনে তোমরা আশ্চর্য হচ্ছ, কিন্তু আগেই ত বলেছি সীলের পূর্ব-পুরুষ ডাঙার বাসিন্দা ছিল। সেই জন্যেই তাদের বাচ্চারা জন্মেই মাছেদের মত সাঁতরাতে পারে না। ধীরে ধীরে তাদের শেখাতে হয়।

সীলেদের অন্যান্য জাতের ভেতর সাগর-সিংহের নাম সবার আগে করা উচিত। এদের নাম সার্থক। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে এরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রধান খাদ্য হ'ল অক্টোপাস আর তার জাত ভাই স্কুইড। জলের ভেতর এরা সামনের দুই পায়ের পাখনার সাহায্যে বেশ বেগে যেতে পারে। ডাঙায় এদের অনেকটা অসহায় ও নিরীহ বলে মনে হয়, কিন্তু জলে নামলেই এদের প্রকাশ পায় স্বরূপ। তখন তাদের চোখে হিংস্র শ্বাপদের তীক্ষ্ণতা। জলে এরা বড় কাউকে ভয় করে না। হাঙরেরা পর্যন্ত তখন এদের কাছে সাধ করে ঘেঁষতে চায় না।

সাগর-ভল্লুক সাগর-সিংহেরই ভাই। এদের গায়ের লোমওয়ালা চামড়ার দাম খুব বেশী বলে এদের ওপরই শিকারীদের বিশেষ নজর।

এই সমস্ত কানওয়ালা সীল মাছ, আসল সীলের চেয়ে ডাঙায় অনেক সহজে চলা-ফেরা করতে পারে। সমুদ্র কূলের পাহাড় বেয়ে ওঠাও এদের পক্ষে অসম্ভব নয়। বছরের সাত আট মাস সমুদ্রে ঘুরে কাটিয়ে, এরা কিছুকালের জন্যে কোন নির্জন দ্বীপ দখল করে। সেই দ্বীপেই এদের বাচ্চা হয়। সে বাচ্চাকে সাঁতার শিখিয়ে বড় করে তারপর আবার এরা সমুদ্রে বেরোয়।

কানওয়ালা সীল ও আসল সীলের মাঝামাঝি জাত হ'ল ওয়ালরস্ বা সিন্ধুঘোটক। আকারে এরাই সবচেয়ে বড়। সাগর-সিংহ জাতের সীল লম্বায় প্রায় বার ফিট এবং ওজনে প্রায় ১৬।১৭ মন পর্যন্ত হয়। কিন্তু দৈর্ঘ্য খুব বেশী না হোক সিন্ধুঘোটকের ওজন ৩৬।৩৭ মন পর্যন্ত দেখা গেছে। সিন্ধুঘোটকের প্রধান বিশেষত্ব হ'ল তাদের ছুটি দাঁত। ওপরের মাড়ি থেকে এই ছুটি নিরেট ছুঁচল দাঁত নেমেছে। এ দাঁত ছুই ফুট আট ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। সিন্ধুঘোটক সাধারণতঃ নিরীহ প্রাণী। কিন্তু ক্ষেপলে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। উত্তর মেরুর সাদা ভালুককে পর্যন্ত তখন তারা এই দাঁতে কাবু করে দেয়। সাধারণতঃ এই দাঁত বরফ খুঁড়ে ঝিনুক প্রভৃতি খুঁজে বার করবার জন্যই ব্যবহার করা হয়। ঝিনুক জাতের জীবই সিন্ধুঘোটকের প্রধান খাদ্য। সিন্ধুঘোটক জলের অন্যান্য সীলেদের মত অত ঝানু সাঁতারু নয়। সেই জন্যে দূর সমুদ্রে ভরসা করে তাদের বার হতে দেখা যায় না। মেরুর বরফ ঢাকা অঞ্চলে কূলের কাছাকাছি জায়গায় সিন্ধুঘোটক চরে বেড়ায়।

সিন্ধুঘোটক বা সাগর-সিংহ বা আসল সীল এরা সবাই অসম্ভব রকম খেতে পারে। এদের ক্ষিদে যেন কিছুতেই মেটে না। জোয়ান একটি সাগর-সিংহের দিনে আধ মন মাছ পরিমিত আহার। এত বেশী না খেলেও এদের চলে না। বরফের মত ঠাণ্ডা জলে রক্ত গরম রাখবার জন্যে এ রকম খাওয়া দরকার।

সীল সম্বন্ধে একটি দুঃখের ব্যাপার এই যে ক্রমশঃই এরা পৃথিবী থেকে লোপ পাচ্ছে, শুধু মানুষের অপরিমিত লোভ ও নিষ্ঠুরতার ফলে। কোন সীল মাছের চামড়া, কারুর বা দাঁত, কারুর বা চর্বি, মানুষের কাছে ব্যবসার জন্য মূল্যবান। সেই জন্যে শিকারীরা নির্মম ভাবে সীল বংশ ধ্বংস করে আসছে নিয়মিত ভাবে। যে ভাবে তারা সীলেদের সংহার করে, তার বিবরণ পড়লে চোখে জল আসে। কানওয়ালা সীলেরা বাচ্চা হওয়ার আগে নির্জন কোন দ্বীপ আশ্রয় করে, সে কথা আগেই বলেছি। শিকারীরা সন্ধান ক'রে সেই সকল দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর নির্মমভাবে অসহায় সীলেদের সমুদ্র থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় ডাঙার ভেতরে। পাথুরে উঁচু নীচু, এব্ড়ো খেব্ড়ো জমির ওপর দিয়ে, অসহায় ভীত সীলের দল পাখনা ঘষড়াতে ঘষড়াতে, কাতর ভাবে হাঁফাতে হাঁফাতে, এগোবার চেষ্টা করে। তাদের মুখ দিয়ে ফেনা ঝরে পড়ে। তাদের চোখ যেন ফেটে বেরিয়ে পড়তে চায় বেদনায়। মাইলের পর মাইল তাদের এই ভাবে তাড়িয়ে বধ্যভূমিতে আনা হয়। সেখানে লোহার মুগুর হাতে পিশাচের মত ঘাতকেরা দাঁড়িয়ে আছে। পথ সেখানে সঙ্কীর্ণ। সীলেরা সে সঙ্কীর্ণ পথে একটির পর একটি হাঁফাতে হাঁফাতে কাতর ভাবে এগিয়ে আসে। আর ঘাতকেরা প্রচণ্ড বেগে তাদের মুগুর সেই নিরীহ অসহায় প্রাণীর মাথায় বসিয়ে দেয়। সেই এক ঘায়েই সীলেদের খুলি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তাদের স্ফটিকের মত উজ্জ্বল চোখ

কখন কখন মাথা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসে। রক্তে মাটি ভিজে যায়।

এ নারকীয় দৃশ্য বর্ণনা করতেও কলম চলে না। তথাকথিত সভ্য মানুষ, নিজেদের সামান্য একটু সুবিধার জন্যে, কতদূর পৈশাচিক যে হ'তে পারে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর উদাহরণ তার বুঝি আর নেই। নিতান্ত প্রয়োজন যদি হয়ও, তবু সীলেদের এত যন্ত্রণা দিয়ে এমন নিষ্ঠুর ভাবে না মারলেও চলে। কিন্তু অর্থের লোভে অন্ধ ব্যবসায়ী ও শিকারীরা সবচেয়ে সহজ ও সস্তা বলেই এই উপায় গ্রহণ করেছে, আর কোন দিকে দৃষ্টি দেয় নি।

নিষ্ঠুর ভাবে নির্বিচারে এমনি করে হত্যা করার ফলে সীল ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে পড়ার পর, শ্বেতাঙ্গ জাতের টনক নড়েছে। সম্প্রতি নানা জাতের মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে যে, বছরে বিশেষ একটি সংখ্যার বেশী সীল কেউ মারতে পারবে না। এ চুক্তি করার ভেতর ব্যবসায় বুদ্ধি যতখানি আছে, মায়া মমতার পরিচয় ততখানি আছে কি না সন্দেহ! এমন চুক্তি করেও লুপ্তপ্রায় সীল বংশকে আর রক্ষা করা যাবে কি না সন্দেহ। সীলেদের ভাগ্যের কথা ভাবলে দুঃখ হয়। একদিন ডাঙার দখল সেখানকার প্রাণীদের ছেড়ে দিয়ে, বাসাটাসা তুলে তারা সমুদ্রে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও তারা স্বস্তি পেল না। ডাঙার জীবই আবার তাদের কাল হয়ে উঠল।

শুধু প্রবাল না বলে, প্রবালের উপনিবেশ বলাই উচিত। কারণ বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাল সামান্য একটি ফুলের কুঁড়ির মত প্রাণী মাত্র। তাদের উপনিবেশগুলিই অমন বিচিত্র।

প্রবাল, ফুলের কুঁড়ির মত, এক রকমের সামুদ্রিক প্রাণী হলেও, অনেক সময়ে উদ্ভিদ জাতীয় জীবের সঙ্গে একান্নবর্তী পরিবারে মিলে মিশে ঘর করে। উদ্ভিদ জাতীয় প্রাণীটি অবশ্য নিতান্ত ক্ষুদ্র, উদ্ভিদের একটি সবুজ কোষ মাত্র। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হ'ল 'অ্যাল্‌জি'! প্রবালেরা এক সঙ্গে দল বেঁধে বাস করে, আর তাদের দেহে এই উদ্ভিদকোষ থাকে দল বেঁধে। উদ্ভিদকোষগুলি প্রবাল কুঁড়ির আশ্রয়ে থাকতে পাওয়ার জন্য, নিজের দেহ দিয়ে ভাড়া চুকিয়ে দেয়। তাতে তাদের বিশেষ লোকসান অবশ্য হয় না, কারণ প্রবালের পেটে তারা যতগুলি হজম হয়, তার চেয়ে বংশবৃদ্ধি হয় তাদের বেশী। প্রবাল-কুঁড়িগুলির শুধু যে এই 'অ্যাল্‌জি'ই সম্বল, তা নয়, তারা নিজেরাও সমুদ্রের প্রাণী শিকার করে খায়।

প্রবালের ভেতরের কাঠাম, চুন দিয়ে তৈরী হয়। কোন কোন প্রবাল আবার চুনের খোলসের মধ্যেই বাস করে। প্রবাল মারা যাবার পর, তাদের এই চুনের খোলস বা কাঠাম, থেকে যায়। সেগুলির উপর আবার নতুন প্রবালেরা নিজেদের উপনিবেশ বসায়। এমনি করে যুগযুগান্ত ধরে তাদের কঙ্কাল পর-পর জমে উঠে' শেষকালে প্রবাল দ্বীপ হয়ে উঠে।

এখন যে সব প্রবাল দ্বীপ আমরা দেখছি—দশ লক্ষ বৎসর ধরে নিজেদের অস্থি জমা করে, প্রবালেরা সে সব গড়ে তুলেছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে দশ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে যখন তুষার-যুগ এসেছিল, তখন থেকে প্রবালেরা কাজ শুরু করেছে। সমস্ত জল তুষার হয়ে, পৃথিবীর উপর জমা হয়ে থাকার দরুন, তখন সমুদ্রগুলি

ছিল অগভীর। সে তুষার-যুগ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে, সমুদ্রের জল বেড়েছে এবং প্রবালের কাজও এগিয়ে গিয়েছে। সমুদ্র তুষার যুগে অগভীর না হয়ে গেলে, এখনকার অনেক প্রবাল দ্বীপ তৈরী হ'ত না। কারণ প্রবাল খুব গভীর সমুদ্রের তলায় বাঁচে না। সমুদ্রে জল তখন অল্প ছিল বলেই, প্রবালেরা কাজ শুরু করতে পেরেছিল।

প্রবাল

সমুদ্রের প্রাণীজগতের রহস্যের কথা বলতে গিয়ে প্রবালের উল্লেখ না করলে সমস্তই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মানুষের দিক থেকে প্রবালই বুঝি সবচেয়ে মূল্যবান। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী অসীম অধ্যবসায়ের ফলে অতল সমুদ্রে মানুষের জন্যে অসংখ্য দ্বীপ নির্মাণ করে তুলেছে এবং এখনও করছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমস্ত দ্বীপের সৌন্দর্য দেখে পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে এসেছে বলে মনে হয়, সেগুলি এই আকারে নগণ্য প্রাণীদেরই বহু যুগের সমবেত চেষ্টার ফল। ধীরে ধীরে যুগযুগান্ত ধরে নিজেদের দেহের কঙ্কাল দিয়ে তারা এ দ্বীপ রচনা করে তোলে।

প্রবাল দ্বীপ বিষুবরেখার কাছাকাছি সমুদ্রের উষ্ণ অগভীর প্রদেশেই দেখা যায়। তার কারণ এই যে, প্রবাল-কীট যে চুনের দ্বারা তার শরীর গঠন করে, অপেক্ষাকৃত গরম জল থেকেই সে চুন তার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব। শীতল সমুদ্রে কোন প্রবাল দ্বীপ নেই।

প্রবাল-দ্বীপ তিন রকম। সমুদ্র-তট থেকে কিছু দূরে তার ধারে ধারে সমান্তরাল এক রকম প্রবাল-দ্বীপ দেখা যায়—দ্বীপের বদলে সেগুলিকে প্রবাল-প্রাচীর বলাই উচিত। এই প্রাচীরগুলি জলের ভেতর খাড়া হয়ে থেকে সমুদ্রকূলকে যেন পাহারা দেয়, বড় বড় ঢেউ এই প্রাচীরে এসেই ভেঙে পড়ে, তটের ধারে জল অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে।

আর এক রকম প্রবাল দ্বীপের মাঝখানে জল ও চারিধারে প্রবালের দেওয়াল থাকে। সমুদ্রের খানিকটা অংশ ঘিরে প্রবালেরা

যেন বিরাট নকল হ্রদ তৈরী করে। এই প্রবালের দেওয়ালে ঘেরা জলের নাম ইংরাজীতে 'লেগুন'। 'লেগুন'গুলি বেশ গভীর হয় বলে, বন্দর হিসাবে ব্যবহার করবার যোগ্য। বাইরের দুরন্ত সমুদ্র থেকে দরকার হলে জাহাজগুলি এখানকার শান্ত জলে আশ্রয় নিতে পারে। এককালে এমনি বহু 'লেগুন' প্রশান্ত মহাসাগরে অনেক জল-দস্যুর গোপন আড্ডা ছিল। বাইরের সমুদ্রে লুটতরাজ করে তারা জাহাজ নিয়ে এই সমস্ত জায়গায় লুকিয়ে থাকত।

তৃতীয় ধরনের প্রবাল দ্বীপগুলিকে সত্যই দ্বীপ বলা যায়। সমুদ্রের উপর সেগুলি নদীর চরের মত জেগে উঠেছে। ফলে-ফুলে সুশোভিত এই দ্বীপগুলির সৌন্দর্য সত্যই অপরূপ।

প্রবালের নিজস্ব সৌন্দর্যও অসাধারণ। তাদের বৈচিত্র্যের সীমা নেই। লাল, নীল, সবুজ, হলদে, নানা রঙের প্রবাল দেখা যায়। জলের তলায় ডুব দিয়ে যাঁরা প্রবালের জগৎ চাক্ষুষ দেখেছেন, তাঁদের মতে পৃথিবীর কোন দৃশ্যের সঙ্গে তার তুলনা হতে পারে না। সে যেন স্বপ্নময় পরীর রাজ্য। সেখানে যে সব মাছ ঘুরে বেড়ায় প্রবালের বিচিত্র রঙ ও রূপের দ্বারা যেন অনুপ্রাণিত হয়ে, তারাও আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। জলের তলা থেকে সেখানে প্রবালের থাম উঠেছে। প্রবালের বহুবর্ণ খিলান, প্রবালের দরজা, প্রবালের গুহাপথ, আর তার মাঝে ছুটে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির চেয়েও বিচিত্র সব মাছ, নানা আকারের নানা বর্ণের তারামাছ, ঝিনুক, আর কাঁকড়া।

প্রবাল নানা ধরনের হয়। কোন জাতের প্রবাল, গাছের মত শাখায় প্রশাখায় ছড়িয়ে বেড়ে ওঠে উপর দিকে, কোন জাতের প্রবাল, আবার মানুষের মাথার মত গোল হয়ে বাড়ে। এক জাতের প্রবাল দেখলে, সারি সারি ফল বলে মনে হয়। এগুলিকে

অসংখ্য বিশেষ ধরনের কোষ দেখা যায়। শরীরের নানা অংশের বিশেষ কাজের জন্যই তারা তৈরী। কিন্তু স্পঞ্জে মাত্র তিন চার রকমের জীব-কোষ আছে। এক ধরনের জীব-কোষগুলি থেকে সূক্ষ্ম শুঁড়গুলি তৈরী। আর এক ধরনের কোষ আছে, স্পঞ্জের গায়ের ওপরকার খোলসে। স্পঞ্জের শরীরে আর প্রত্যেক মুখের কাছে গলায় যে দুই ধরনের জীব-কোষ আছে, সেগুলি ছাড়া আর একটি জীব-কোষ স্পঞ্জের দেহে ইচ্ছামত স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, অনেকটা আমাদের দেহে শাদা রক্ত-কণিকার মত। এগুলির কাজ যে কি, তা কিন্তু ঠিক বলা যায় না। দেহে জটিলতা নেই বলেই স্পঞ্জ পুরাণের রক্তবীজের মত অমর। কুচি কুচি করে তাকে যদি কেটে ফেলা যায়, তবু সে মরবে না। তার প্রত্যেকটি কুচি থেকে আবার একটি স্পঞ্জ গড়ে উঠবে। সমুদ্রের নীচু স্তরের আরো অনেক প্রাণীর এই রকম ক্ষমতা আছে। প্রবালেরই এমন সব জ্ঞাতি আছে, যাদের দেহ খুব সূক্ষ্ম। তারের ছাঁকনির ভেতর দিয়ে জোর করে চালিয়ে দিয়ে সমস্ত দেহ-কোষগুলি আলাদা করে ফেল্লেও, তারা মারা পড়ে না। বিচ্ছিন্ন কোষগুলি আবার পরস্পরকে খুঁজে নিয়ে, যে যার জায়গা দখল করে, আস্ত প্রাণী হয়ে উঠে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের হাত, পা, মুণ্ড, ধড় সব যদি কাটা পড়ে আলাদা হয়ে যাবার পর, আবার নিজেরাই খুঁজে পেতে নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যথাস্থানে জোড়া লেগে যায়, এবং কাটা সৈনিক উঠে বসে প্রাণ পায়, তাহলেও ব্যাপারটা প্রবালের এই জ্ঞাতির পুনর্জন্মের মত বিস্ময়কর হয় না। কারণ, শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নয়, দেহের সমস্ত কোষই এদের আলাদা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও, এরা আবার গোটা হয়ে ওঠে।

শুধু সমুদ্রে নয়, স্পঞ্জ নদীর জলে ও পুকুরে পর্যন্ত হয়। সমুদ্রের এক রকম কাঁকড়ার গায়েও তারা অনেক সময়ে বাসা

বেঁধে কাঁকড়াকে বাহন করে ঘুরে বেড়ায়। তাদের আকারও হয় অনেক রকম। কলকাতার মিউজিয়ামে নীচের তলার পূবের বড় ঘরে, এক রকম প্রকাণ্ড স্পঞ্জ দেখতে পাবে। তাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'বরুণের গেলাস'। দেখতে সে স্পঞ্জ সত্যি ফুটবল খেলায় জিতে যে রকম 'কাপ' পাওয়া যায়, তার চেয়েও প্রকাণ্ড। স্পঞ্জের আরো যে সব অদ্ভুত আকার আছে, তাই ধরেই সাধারণতঃ তাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। কিন্তু তাতে গোলও মাঝে মাঝে বাধে। একই জাতের স্পঞ্জ সব সময়ে নির্দিষ্ট একটি আকারই গ্রহণ করে এমন নয়। খেয়াল মত তাদের বদলাতেও দেখা যায়। সেটা খুব অসাধারণ ব্যাপার নয়। বরং স্পঞ্জের মত অত্যন্ত নীচু স্তরের জটিলতাহীন প্রাণীর, বিশেষ একটি আকার জাতিগত ভাবে গ্রহণ করাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

সমুদ্রের প্রধান কয়েকটি প্রাণীর মোটামুটি যে পরিচয় দেওয়া হ'ল, তা থেকে সমুদ্রের জীবন-বৈচিত্র্যের খানিকটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু সাগরের রহস্য সাগরের মতই অসীম অগাধ। যতখানি তার জানা গেছে, তাও বই-এর পর বই লিখলেও শেষ করা যায় না। এক মেরু থেকে আরেক মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সমুদ্র, গরম ঠাণ্ডা তার নানা স্রোত, তার আবার স্তর-ভেদ—সব সুদ্ধ নিয়ে এমন একটা বিরাট ব্যাপার যা কল্পনা করাও শক্ত। জলের ওপরের দিকের অদৃশ্য আনুবীক্ষণিক গাছ-জাতীয় 'প্ল্যাঙ্কটন', সমুদ্রের এই সমস্ত প্রাণী জগতের মূল আহার। সেই মূল আহার, পরের পর ছোট থেকে বড় নানা প্রাণীর মধ্য দিয়ে, হাঙ্গর থেকে বড় তিমিকে পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে। প্ল্যাঙ্কটনের মতই সূক্ষ্ম, জলের পোকা থেকে তারামাছ, অক্টোপাস প্রভৃতি নানা জাতের জীব সেই মূল আহারকে সম্বল করে সুবিধা মত নানা বিচিত্র রূপ গ্রহণ করেছে।

স্পঞ্জ

স্পঞ্জ তোমরা অনেকেই দেখেছ। এ জিনিসটি যে সমুদ্রে পাওয়া যায়, তাও অনেকে হয়ত শুনেছ। কিন্তু আসলে এটি যে কি,—তা তোমরা বোধ হয় জান না। একশ বছর আগে বৈজ্ঞানিকেরাও ঠিক জানতেন না। তাঁদের অনেকের ধারণা ছিল, স্পঞ্জ এক রকম সাগরের উদ্ভিদ। উদ্ভিদ বলে মনে করাই স্বাভাবিক, কারণ স্পঞ্জ জলের তলায় এক জায়গায় আটকে থাকে। নড়ে চড়ে বেড়ান দূরে থাক, তার ভেতর কোন প্রকার প্রাণের লক্ষণই দেখা যায় না। অনেক বৈজ্ঞানিকের আবার ধারণা ছিল যে, স্পঞ্জ হয়ত প্রবালের মত সামুদ্রিক পোকা-মাকড়ের শরীরের পরিত্যক্ত অংশ। স্পঞ্জের চারিধারে এবং নানা গর্তের ভেতরে ছোট ছোট অনেক পোকাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। তাই জন্যেই স্পঞ্জ সেই পোকাদেরই তৈরী বলে তাঁদের মনে হয়েছিল। কিন্তু ঠিক একশ বছর আগে, রবার্ট গ্রাণ্ট নামে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্পঞ্জের আসল রহস্য উদ্ধার করে, এ সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূর করে দেন।

বাজারে যে স্পঞ্জ কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলির ভেতর অসংখ্য ছোট বড় ফুটো তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। ফুটোয় ফুটোয় স্পঞ্জ একেবারে ঝাঁজরা বলা যায় এবং এই অসংখ্য ফুটোই স্পঞ্জের বিশেষত্ব। সেই ফুটোগুলি থাকার দরুনই স্পঞ্জ অনায়াসে অত জল শুষে নিতে পারে। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সে ফুটো নানা রকম। আঙ্গুল গলে যায়, এমন বড় ফুটো আছে, আবার আছে অতি সূক্ষ্ম শাখাপ্রশাখায় ভাগ করা ছিদ্রপথ। অসংখ্য

সুড়ঙ্গওয়ালা, গোলক ধাঁধার মত, স্পঞ্জের সমস্ত ছিদ্রগুলিই ভেতরের দিকে চলে গিয়েছে বিচিত্র ভাবে।

এই ছিদ্রগুলিকে ভালো করে লক্ষ্য করেই, রবার্ট গ্র্যাণ্ট স্পঞ্জের রহস্য ভেদ করেন। আমরা যে স্পঞ্জ ব্যবহার করি, সেগুলি আসল স্পঞ্জের শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয়। আসল স্পঞ্জ অনেকটা টাট্‌কা যকৃতের মত দেখতে। জলের তলায় তাদের নানা আকার ও নানা বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায় বটে, কিন্তু জীবন প্রণালী তাদের এক রকম। যে সূক্ষ্ম ফুটোগুলির কথা আগে বলা হয়েছে, জীবিত স্পঞ্জের বেলায় সেগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চুলের চেয়েও সরু এক একটি শুঁড়ের মত জিনিস প্রত্যেক ফুটোর মুখে অনবরত আন্দোলিত হয়ে জলের স্রোত তৈরী করছে। সে জলের স্রোত স্পঞ্জের ভেতর নানা সুড়ঙ্গ পথে প্রবাহিত হয়ে, বড় বড় ফুটোগুলি দিয়ে আবার বেরিয়ে যায়। স্পঞ্জের আহার সংগ্রহের এই হ'ল ফন্দি। জলের স্রোতে যে সমস্ত আণুবীক্ষণিক প্রাণী ও জৈব পদার্থ ফুটোগুলির ভেতর প্রবেশ করে, স্পঞ্জ সেইগুলিকেই আত্মসাৎ করে নেয়। স্পঞ্জ উদ্ভিদ নয়—প্রাণীই, কিন্তু সম্পূর্ণ অদ্ভুত ধরনের। প্রাণী বলতে আমরা যা মনে করি, তার সঙ্গে কিছুই তার মেলে না। ফুলের মত যে সামুদ্রিক প্রাণীর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরও বিশেষ একটি মুখ আছে, বিশেষ হজম করবার মত উদর। কিন্তু স্পঞ্জের সমস্ত দেহময়ই তার মুখ, সমস্ত দেহই তার উদর। সমুদ্রের তলায় এই নিরীহ চেহারার জীবটি, যাদুকর দৈত্যের মত, অদ্ভুত এক ফাঁদ পেতে রেখেছে। একবার সে ফাঁদের কাছাকাছি এলেই হ'ল, আর নিস্তার নেই। অসংখ্য মুখ সেখানে হাঁ করে আছে, গ্রাস করবার জন্যে।

প্রাণী হিসাবে স্পঞ্জের দেহ-কোষের কিন্তু বিশেষ জটিলতা নেই। মানুষের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, খুব নীচু স্তরের প্রাণীরও দেহে

আগুনের গোলা। সেই গোলা ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে তরল হবার সময়, আমাদের চাঁদ একদিন তা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে যায়। পৃথিবী তারপর আরো ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে, ভারী সমস্ত পদার্থ তার মধ্যখানে জমা হয়ে হাল্কা তরল জিনিসগুলিকে যেন নিংড়ে ওপরে ঠেলে তুলে দেয়। সেই হাল্কা তরল জিনিসগুলিই, ঠাণ্ডা হয়ে জমে গিয়ে, সরের মত পৃথিবীর উপরের খোলস তৈরী করে। সেই সরের আচ্ছাদন, মোটা কম্বলের মত, পৃথিবীর ভেতরকার উত্তাপকে বাইরে বেরুতে দেয় না। নীচের ভারী সমস্ত পাথর, তাই আরো উত্তপ্ত হয়ে, গলে উঠে, আগ্নেয়গিরির লাভার মত ওপরে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসে। যে সব জায়গায় ওপরকার সর পাতলা, সেখানেও সেই তরল পাথর চুইয়ে ওঠে। ভূতত্ত্ববিদ-দের ধারণা যে, এই গলিত পাথরের ভারেই পৃথিবীর ওপরকার সরের মত আচ্ছাদন অনেক জায়গায় দেবে যায়। এবং সেই দেবে যাওয়া জায়গাগুলিই, পৃথিবীর প্রথম সমুদ্রের আধার। আধার থাকলেও তখনও জল ছিল না। আকাশে তখন ঘন উষ্ণ বাষ্পের মেঘ আর পৃথিবীর ওপরে উত্তপ্ত পাথর। সেই মেঘ থেকে বৃষ্টি, সেই তপ্ত পৃথিবীর ওপর পড়তে না পড়তেই, আবার বাষ্প হয়ে যেত উড়ে। কিছুদিন বাদে পৃথিবীর ওপরকার খোলস, আরো একটু ঠাণ্ডা হলে পরে আকাশের বৃষ্টি জল হয়ে পৃথিবীর ওপর বয়ে যাবার সুযোগ পেল। সেই বৃষ্টির জলের ধারাই, ক্রমশঃ পৃথিবীর নীচু জায়গাগুলিতে জমা হয়ে, পৃথিবীর প্রথম সাগর সৃষ্টি করলে।

সাগর-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য প্রাণের আবির্ভাব হয়নি। তখনও আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। সে মেঘের স্তর ভেদ করে সূর্যের আলো তখনও পৃথিবীর ওপর এসে পড়তে পারে নি। সূর্য ও পৃথিবীর চোখোচোখি হওয়ার পরই যে সমুদ্রকুলের অগভীর

জলে প্রাণের আবির্ভাব হয়, এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু তাঁরা প্রাণের আবির্ভাবের সময় ও অবস্থা এখনও ঠিক ভাবে বলতে পারেন না।

প্রাণি-রূপের এই বৈচিত্র্য সমুদ্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। আগেই বলেছি যে, ডাঙ্গায় সমুদ্রের মত এত রূপের বৈচিত্র্য নেই। তার কারণ এই যে সমুদ্রেই প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয়েছিল, সমুদ্রে বহুকাল ধরে নানা রূপ গ্রহণের পর তাদের কয়েকটি মাত্র ডাঙ্গায় এসেছিল উঠে— বেশীর ভাগই রয়ে গেছে সমুদ্রে। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞাতিগোষ্ঠী, খুঁজলে সমুদ্রে পাওয়া যাবে, কিন্তু সমুদ্রের অনেক প্রাণীর ডাঙ্গায় কোন প্রতিনিধি নেই। অক্টোপাস, তারামাছ, প্রবাল, স্পঞ্জ এরা একান্ত ভাবে সমুদ্রেরই জীব। এদের আত্মীয়স্বজন কত আকারে, কত ভাবে, যে সমুদ্রে নিজেদের বংশ বিস্তার করেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমাদের জানতে এখনো বাকী। তাছাড়া সমুদ্রে এখনো সম্পূর্ণ অজানা কোন নতুন ধরনের প্রাণী আছে কি না, তাই বা কে জানে। জোর করে হাঁ, না, কিছুই বলা উচিত নয়, কারণ সমুদ্র অগাধ, আর মানুষ সেদিন মাত্র বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে সন্ধান করতে শুরু করেছে।

সমুদ্রের ইতিহাস

সমুদ্রে আমরা এত রকম বিচিত্র যে সব প্রাণীর পরিচয় পেলাম, তারা কিন্তু হঠাৎ একদিনে আলাদা আলাদা হয়ে আবির্ভূত হয় নি। কোটি কোটি যুগ লেগেছে তাদের বর্তমান অবস্থায় পৌঁছোতে। একটি জলের ধারা থেকে যেমন অসংখ্য শাখা বেরিয়ে বয়ে চলে, তারাও তেমনি একই মূল ধারা থেকে, ক্রমশঃ তফাত হ'তে হ'তে, এত রকম বিচিত্র রূপ লাভ করেছে। আদি সমুদ্রে প্রথম প্রাণ-কণিকা কেমন করে যে আবির্ভূত হয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু কোটি কোটি যুগ ধরে সেই প্রাণ-কণিকার বংশধারাই যে নানা পথে জটিল থেকে জটিলতর, বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রূপ নিয়ে বর্তমান পৃথিবীর জল স্থল আকাশ ছেয়ে দিয়েছে এ কথা ঠিক। বিশাল তিমির সঙ্গে সামান্য একটি মাঠের ফড়িঙের সে হিসেবে আত্মীয়তা আছে। অবশ্য সে আত্মীয়তা খুঁজে বার করতে গেলে কোটি বছরের কুলজীতেও কুলোবে না।

সমুদ্রে যখন প্রথম প্রাণ-কণিকার আবির্ভাব হয়েছিল, তখন সমুদ্রের চেহারাও ছিল আলাদা। তখন সমুদ্র এত গভীর ছিল না, এত নোনাও নয়। আকাশ তখন প্রায়ই থাকত ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, সমস্ত পৃথিবীতে অত্যন্ত গুমোট, আর সমুদ্রের নাতিশীতল জলে অনবরত বৃষ্টি পড়ত, আমরা যাকে মুষলধারে বলি, তারও চেয়ে অনেক প্রবল ভাবে।

পৃথিবীতে সমুদ্রের সৃষ্টিও হয়েছে এমনি বৃষ্টি থেকে। তোমরা অনেকেই জান যে, এই পৃথিবী একদিন ছিল সূর্যের মতই জ্বলন্ত

বিছে, মাকড়সা প্রভৃতির আদি পূর্বপুরুষের জ্ঞাতি। তারা ধীরে ধীরে আকারে ও শক্তিতে ট্রিলোবাইটদের ছাড়িয়ে গিয়ে, তাদের জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দেয়। সাগর-বিচ্ছু বা ইউরিস্টেরিড্স লম্বায় নয় ফুট পর্যন্ত পাওয়া গেছে। তারাও সমুদ্রের তলায় ঘুরে বেড়াত, ধীরে ধীরে পেছনের পা দুটিকে দাঁড়ের মত ব্যবহার ক'রে তারা সাঁতরাতেও পারত। 'সাগর-বিচ্ছু'দের সম্বন্ধে সবচেয়ে মজার কথা এই যে, সাগরে উদ্ভূত হয়ে, গোড়ার দিকে সাগরেই জীবন কাটালেও, তাদের বংশধরেরা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে নদী, হ্রদ প্রভৃতির মিষ্ট জলের জগতে বাস করতে শুরু করেছিল। সাগর-বিচ্ছুর জ্ঞাতি-গোত্র সবাই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, হয়নি শুধু একটি। তাদের নাম 'রাজ-কাঁকড়া।' 'রাজ-কাঁকড়া' আমেরিকার উপকূলে কোথাও কোথাও এত প্রচুর পাওয়া যায় যে, তাদের মৃতদেহ সার হিসাবে সেখানকার লোকেরা ব্যবহার করে।

এই সমস্ত পোকা জাতীয় জীবের সঙ্গে আর একটি প্রাণীও সমুদ্রে নিজের অধিকার বিস্তার করছিল। সে হ'ল 'তারামাছের' আদিপুরুষ। তারামাছের গোষ্ঠী কেউ সমুদ্র থেকে ডাঙ্গায় উঠতে পারে নি, কোটি কোটি বছরের ইতিহাসে তাদের মাথা বলতে আমরা যে রকম শরীরের অংশ বুঝি তেমন কিছুও সৃষ্ট হয় নি। তারা সৃষ্টির কবন্ধ জানোয়ার—স্পঞ্জের চেয়ে এক ধাপ উঁচু। কিন্তু তারামাছের বংশ একটা অসাধ্য সাধন করেছে। 'সাগর বিচ্ছুদের' সময়ে তারামাছেরা এখনকার মত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করতে পারত না। তাদের পুরুষেরা সকলেই থাকত গাছের মত এক জায়গায় আটকে। ধীরে ধীরে তারা সেই অচলতা কাটিয়ে উঠেছে। তখন ওপরের দিকে মুখ তাদের তোলা থাকত। এখন তাদের মুখ নীচের দিকে, পাঁচদিকে পাঁচটি পাও অনেক পরে

তাদের বেরিয়েছে। আগে তারা এমন 'পাঁচ-কোণা' ছিল না।

ট্রিলোবাইটদের সঙ্গে ৫০ কোটি বছর আগেকার সমুদ্রে যে শামুকের মত প্রাণী দেখা যেতো, তাদের ধারা থেকেই বর্তমান কালের বিশাল অক্টোপাস থেকে ছোট গুগ্‌লি, শামুক পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে।

অক্টোপাসের পূর্বপুরুষেরা, অনেকটা আজকালকার শামুকের মতই, সমুদ্রের তলায় বুকে হেঁটে ঘুরে বেড়াত। তাদের তখন অনেকটা শামুকের মতই খোলস ছিল বাইরের দিকে। আন্দাজ দশ কোটি বছর আগে বর্তমান অক্টোপাসদের মত এক রকম জীব দেখা যায়। তাদের বাইরে কোন খোলস নেই। অনেকটা আমাদের মেরুদণ্ডেরই মত, খোলসের বদলে তাদের শরীরের ভেতরে হাড়ের শক্ত কাঠাম গড়ে উঠেছে। তারা বেগে চলা-ফেরাও করতে পারে সমুদ্রের ভেতরে।

পৃথিবীতে আজ মেরুদণ্ড যাদের আছে, সেই সমস্ত জানো-য়ারেরই প্রাধান্য। বুদ্ধিতে ও বলে শুধু নয়, আকারেও তারা সব জানোয়ারের চেয়ে বড়। তিমির চেয়ে বিশাল জানোয়ার পৃথিবীতে নেই।

সৃষ্টির গোড়ার দিকে এই মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণী কিন্তু ছিল নগণ্য। তখন সাগরে পোকা-মাকড় এবং অন্যান্য প্রাণীরই রাজ্যপাট। ট্রিলোবাইটদের সময় শেষ হবার অনেক দিন পরে প্রথম সমুদ্রে মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের ভেতরই ছিল বর্তমান হাঙ্গরদের আদি পুরুষ। হাঙ্গরদের মেরুদণ্ড কিন্তু ঠিক হাড় নয়, কার্টিলেজ বা উপাস্থি দিয়ে তৈরী। হাড়ের মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট মাছ তাদের পরে সমুদ্রে দেখা দেয়। তখন তাদের আকার ছিল অদ্ভুত। অধিকাংশেরই গায়ে কঠিন বর্ম থাকত।

আদিম সমুদ্রের প্রাণী

প্রথম প্রাণ-কণিকা যে কি রকম ছিল, তা নিয়েও মতভেদ আছে। কারণ কারুর মতে প্রথম প্রাণ-কণিকা ছিল জীবাণু বা উদ্ভিদ জাতীয় কিছু। হয় গোড়া থেকেই তাতে উদ্ভিদের প্রধান বিশেষত্ব, ক্লোরোফিল বা গাছের পাতার সবুজ পদার্থ ছিল, এবং তারই সাহায্যে সে সূর্যের আলোকে জীবনীশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারত, কিংবা অনেক জীবাণুর মত শুধু বাতাস ও জলের জড় পরমাণুকে কাজে লাগিয়েই বেঁচে থাকবার ক্ষমতা তার ছিল। অনেকে আবার মনে করেন যে, কল্পনাতীত সুদূর অতীত যুগে, পৃথিবীতে নানা কারণে এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হয়, যার ফলে প্রোটোপ্লাজমের মত জিনিস গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। সেই প্রোটোপ্লাজম বিন্দুগুলি সবই হয়ত, জীবিত বলতে আমরা যা বুঝি, তা ছিল না। অনেকেরই লীলা বংশবৃদ্ধি করতে না পেরে হয়ত শেষ হয়ে গেছে, শুধু তার মধ্যে যেটি বা যে কয়েকটি নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে বংশবৃদ্ধি করবার উপায় বার করেছিল, তারাই পৃথিবীতে টিকে গিয়ে ভাবীকালের জীবন-বৈচিত্র্যের সূত্রপাত করেছে।

সুদূর অতীতে সমুদ্রে প্রাণের এই উদ্ভব, বৈজ্ঞানিককে কল্পনা করে নিতে হয়। তখন প্রাণীদের দেহ ছিল কোমল জৈব পদার্থে তৈরী। সে জৈব পদার্থ, প্রাণীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে যেত। কোন কঙ্কাল বা কঠিন কোন খোলস, দেহের মৃত্যুর পর, তার সাক্ষী হিসেবে কালের গর্ভে সঞ্চিত থাকত না। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান এই যে, অন্ততঃ ৫০ কোটি বৎসর জীবনের উদ্ভব সত্ত্বেও, এই কারণে

প্রাণি-দেহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তারপর থেকে সামুদ্রিক জীবের ইতিহাস খুঁজে উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। কারণ তখন থেকে নানা প্রাণীর কঙ্কাল বা খোলস, ভূপৃষ্ঠের পর পর স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে। বহু কোমল-দেহ জীবেরা, তখন হয় শক্ত খোলস, নয় কঙ্কাল আশ্রয় করতে শুরু করেছে। সেই সমস্ত কঙ্কাল ও খোলস থেকে তখনকার প্রাণীদের পরিচয় ও ইতিহাস বৈজ্ঞানিকেরা গড়ে তুলেছেন। কঙ্কাল ও খোলসগুলি যেন জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে ছেঁড়া, পোকায় কাটা পাতা। ধৈর্য সহকারে বৈজ্ঞানিকদের তার লিপি উদ্ধার করে, সমস্ত বইখানির সুসম্বদ্ধ অর্থ করতে হয়েছে। তাঁদের উদ্ধার করার ইতিহাস সত্যিই অপরূপ ও কল্পনাতীত।

আন্দাজ ৫০ কোটি বর্ষ আগে এই পৃথিবীর অনতিগভীর সাগরের তলায় নানা প্রকার স্পঞ্জ, শামুকের মত জীব ও ট্রিলোবাইট নামে আদিম এক রকম পোকা বিচরণ করত। তখনও ডাঙ্গায় কোন প্রাণী উঠতে পারে নি। সমস্ত স্থল ছিল মরুভূমির চেয়েও জনপ্রাণীহীন। আমাদের মত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট কোন প্রাণী তখনও দেখা দেয় নি, কোন প্রকার মাছও নয়। সত্যিকারের কোন পোকা বা মাকড়সা তখন ছিল না। ট্রিলোবাইটই ছিল সে যুগের সৃষ্টির অধীশ্বর। ট্রিলোবাইটকে ঠিক পোকা বলা উচিত নয়, কারণ সে অনেক নিম্নস্তরের প্রাণী। আজকালকার পোকার মত এত জটিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তার ছিল না। আদিম সমুদ্রের তলায় কাদার ওপর সে বিচরণ করত। অন্যান্য প্রাণীর মৃতদেহই ছিল তার আহার। ট্রিলোবাইটেরা লম্বায় ছ'ফুট পর্যন্ত হ'ত।

ট্রিলোবাইটেরা পৃথিবীতে দশ কোটি বৎসর রাজত্ব করেছিল বলা যেতে পারে। তারপরে রাজত্ব শুরু হয় সামুদ্রিক কাঁকড়া বিছের। এই সামুদ্রিক কাঁকড়া বিছে সত্যিই বর্তমানকালের কাঁকড়া

সে বর্মের আচ্ছাদনে তাদের আজকালকার মাছের আত্মীয় বলে চেনাই কঠিন। তাদের অনেকটা পোকা-মাকড়ের মতই দেখাত।

এ পর্যন্ত যত প্রাণীর কথা বলা হল, তারা সবাই সামুদ্রিক। তাদের সময়ে ডাঙ্গা কোন জীব জয় করতে পারেনি। জীব-জগৎ তখনও জলেই আবদ্ধ।

বৈজ্ঞানিকেরা অতীত যুগের প্রস্তরস্তর সন্ধান করতে করতে প্রথম মেসোজোইক যুগের একটি পদচিহ্ন পান। সে পদচিহ্নের মূল্য ও ইঙ্গিত যে কতখানি, তা বলে শেষ করা যায় না। পাথরের বুকে অক্ষয় ভাবে মুদ্রিত সেই পায়ের দাগ, সামুদ্রিক জীবের স্থলরাজ্য বিজয় ঘোষণা করছে। বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে মঙ্গল গ্রহ জয় করার চেয়ে আদিম সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর সেই স্থল-বিজয় কম বিস্ময়কর নয়। ডাঙ্গার রাজ্য তখন সত্যই অজানা, ভয়ঙ্কর কল্পনাতীত। কোন প্রাণী সেখানে তার আগে নিশ্চল গ্রহণ করেনি, স্থলপথে চলাফেরার কৌশল কোন প্রাণী তার আগে আরম্ভ করেনি।

মেসোজোইক যুগ স্থল-বিজয়ের গৌরবময় ইতিহাসের জন্যেই অসাধারণ হয়ে আছে। সমুদ্র থেকে নানা প্রাণী নানা ভাবে নূতন অজানা জগতে সেদিন উপনিবেশ স্থাপন করেছে। ডাঙ্গার নূতন পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেমন তাদের মানিয়ে চলতে বাধা পেতে হয়েছে, তেমনি প্রাণি-বহুল সমুদ্রে জীবনের হিংস্র প্রতিযোগিতা থেকেও তারা সেদিন কতকটা রক্ষা পেয়েছে।

স্থল-রাজ্যের এই অভিযান আমাদের আলোচ্য নয়। এই অভিযানে অনেক দূর গিয়ে আবার যে কয়েকটি প্রাণী সমুদ্রে ফিরে এসেছিল, তাদের কথাই কিছু বলব। ইতিপূর্বে তিমি ও সীলের প্রসঙ্গে এ রকম ফিরে আসার কথা জানান হয়েছে। তিমি ও সীল বিবর্তনের অনেক উঁচু ধাপে উঠে তারপর ফিরেছিল

সমুদ্রে। কিন্তু তাদের অনেক আগে আরো বহু প্রাণী সমুদ্রে প্রত্যাবর্তন করেছে। ইক্‌থিয়োসোরস ও প্লিসোরস এমনি দুটি প্রাণী। এ দুটিই ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপ। সমুদ্র থেকে ডাঙ্গায় উঠে বংশপরম্পরায় তারা সেখানে চলাফেরা ও নিশ্বাস গ্রহণের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিদেশে তাদের মন টেঁকেনি বলা যেতে পারে। তাদের বংশধরেরা জলে নামলেও, স্থল-প্রবাসের স্মৃতি কিন্তু ভুলতে পারেনি, সে প্রবাসের জীবন তাদের কাজেও লেগেছিল। স্থলপথে যে পায়ে তারা হাঁটত, জলে নেমে তাই সাঁতার কাটবার জন্য তাদের ব্যবহার করতে হয়েছে, একটু আধটু অদল বদল করে। কিন্তু বুদ্ধিতে ও শক্তিতে তারা ঘরকুণো অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের চেয়ে বড় ছিল বলেই মনে হয়।

ইক্‌থিয়োসোরস ও প্লিসোরস আজকাল অবশ্য টিকে নেই। তাদের স্থল রাজ্যের জ্ঞাতি ভাই ডাইনোসরদের মতই তারা হঠাৎ লুপ্ত হয়ে গেছে আশ্চর্য ভাবে। সরীসৃপ বংশের বাতি এখন টিকটিকি গিরগিটি থেকে আরম্ভ করে, কুমীর ইগুয়ানা প্রভৃতি প্রাণীকে আশ্রয় করে, টিমটিম করে, জ্বলছে মাত্র। সমুদ্রে গ্যালাগ্যাগোস দ্বীপের সামুদ্রিক ইগুয়ানা ছাড়া আর কোন প্রতিনিধি তাদের নেই বললেই হয়। পৃথিবী গর্ভে কয়লা যেদিন সঞ্চিত হচ্ছিল, তখনকার ডাইনোসরদের দোর্দণ্ড প্রতাপের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

নির্বংশ জীবগোষ্ঠী

কলকাতা শহরের কোন পুরাতন বাসিন্দা যদি রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর মত ৬০ বা ৭০ বছর বাদে আজ আবার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তাহলে কি রকম অবাক যে সে হবে, তা বুঝা শক্ত নয়। কলকাতার সে চেহারা আর নেই, শুধু তাই নয়, যান-বাহনও গেছে একেবারে বদলে। কোথায় গেল সে ঘোড়ায় টানা ট্রাম আর ছ্যাকড়া গাড়ি! তার জায়গায় বিদ্যুতের ট্রাম চলেছে মাথায় আঁকশি তুলে, মোটর আর বাস চলেছে রাস্তা দিয়ে হুস হুস করে। তখন যেখানে পৌঁছোতে দু'ঘণ্টা লেগে যেত, এখন সেখানে পনেরো মিনিটে অনায়াসে চলে যাওয়া যায়। মোটরের আর বৈদ্যুতিক ট্রামের কাছে হার মেনে ঘোড়ার গাড়ি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে।

শুধু মানুষের শহরে নয়, প্রাণী-জগতেও এমনি পুরানো অনেক শ্রেণীর জীব যেন ক্লান্ত হয়েই এক এক সময়ে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরে গেছে। তাদের চেয়ে চালাক আর চটপটে প্রাণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে তারা অনেক সময়ে হটে গেছে সত্য, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তাদের বিলোপের এত সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

পৃথিবীর যখন বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল, তখনকার বিরাটকায় ডাইনোসর নামে সরীসৃপের কথা আজ এখানে তুলব না। লক্ষ লক্ষ বছর পৃথিবীতে রাজত্ব করে, আমাদের আজকালকার হাতীদের তিন চার গুণ বড় হওয়া সত্ত্বেও কেমন করে তারা লোপ পেয়ে গেল, তার আশ্চর্য কাহিনী আর একদিন বলব। আজ শুধু সেই সব প্রাণীর কথা আলোচনা করব, মাত্র গত হাজার বছরের
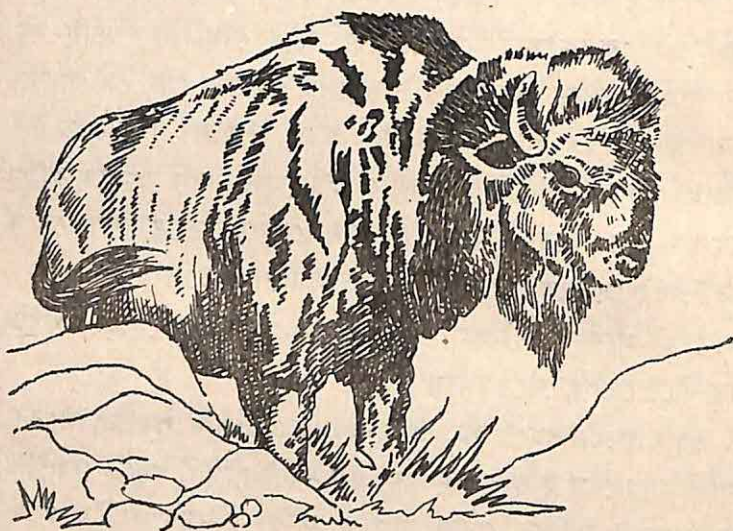
অধুনালুপ্ত আমেরিকার বাইসন

মধ্যে যারা পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে বা এখন পেতে বসেছে।

আমাদের ভারতবর্ষে সেকালের কাব্যে, গল্পে, সিংহের কথার ছড়াছড়ি। পশুর মধ্যে সিংহ হল রাজা, সবচেয়ে প্রধান কোন লোককে, সবচেয়ে জোরালো কিছুকে বোঝাতে হলেই সিংহের উপমা দেওয়া হ'ত।

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশেরই সেকালের এক রাজার নাম ছিল সিংহবাহু, যাঁর ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করেছিলেন। বাঘের চেয়ে সিংহ এদেশে বেশী না হ'ক, কম ছিল না বলেই সিংহের কথা তখন যত শোনা যায়, বাঘের কথা তত নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, আজকাল সেই ভারতবর্ষে সিংহ নেই বললেই হয়। চিড়িয়াখানায় যে সব সিংহ ধরে রাখা হয়েছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে, তাদের সবগুলিই এসেছে আফ্রিকা থেকে। এদেশের সিংহকে অনেক কষ্টে গোয়ালিয়ারের কাছে রাজার খাস জঙ্গলে কয়েকটা বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের শিকার করা মানা। কিন্তু এত যত্ন পাহারা সত্ত্বেও তারা কতদিন আর টিঁকবে বলা শক্ত।

ভারতবর্ষের প্রধান হিংস্র জানোয়ার এখন হল বাঘ। বাঘ ও সিংহ, হিংস্র প্রাণী হিসাবে দুই-ই মানুষের শত্রু। মানুষ জঙ্গল কেটে বসতি করবার সঙ্গে এই দুই হিংস্র প্রাণীকেই উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু বাঘ এমনও টিঁকে থাকা সত্ত্বেও সিংহ যে কেন একেবারে হটে গেল, সে রহস্যের ঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

পৃথিবীতে যে সমস্ত জানোয়ার সম্প্রতি লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে তার জন্যে মানুষই অবশ্য প্রধানতঃ দায়ী। মানুষের হাতেই বা মানুষের প্রভাবের দরুনই অনেক প্রাণী নির্বংশ হয়েছে।

উত্তর-মেরুর কাছাকাছি সমুদ্রে এক কালে নানা জাতের তিমি

প্রচুর দেখা যেত। সমুদ্রের এই অতিকায় প্রাণীটাকে দেখলেই ভয় পাবার কথা। মোচার খোলার মত আগেকার জাহাজ বড় বড় তিমির একটা লেজের ঝাপটেই ডুবে যেতে পারত। তবু মানুষ ত' কিছুতে ভয় পাবার নয়! এই বিশাল তিমি শিকার করতেও সে পেছপা হ'ল না। শেষ পর্যন্ত নরওয়ে আর সুইডেনের লোকের তিমি-শিকার একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। তিমি একটা মারতে পারলে লাভ ত' কম নয়। একটা তিমি মাছের গায়ে যে প্রচুর চর্বি থাকে তা বিক্রি করেই বড়লোক হয়ে যাওয়া যায়। তখনকার পালতোলা জাহাজের দিনে হার্পূন নামে হাতে ছোঁড়া এক রকম বল্লম দিয়ে তিমি-শিকার করা হ'ত। হার্পূনটার গোড়ায় দড়ি বাঁধা থাকত। হার্পূন তিমির গায়ে বিঁধে যাওয়া মাত্র তিমি যখন সমুদ্রে ছুট দিত বা ডুব দিত অগাধ জলে, তখন হুইলের সূতোর মত সেই দড়ি ছেড়ে দেওয়া হ'ত। তারপর আমরা যেমন করে মাছ খেলিয়ে তুলি, তেমনি করে সমুদ্রে হার্পূনে গাঁথা তিমি তারা খেলিয়ে হয়রান করে মেরে ফেলত। হাতে ছোঁড়া হার্পূন দিয়ে তিমি শিকারের বিপদ সেদিন কম ছিল না। তিমি একবার ঘুরে নৌকো উলটে দিলেই হল!

যতদিন হাতে তিমি শিকার করতে হয়েছে ততদিন কিন্তু তিমির বংশ লোপের সম্ভাবনা দেখা যায় নি। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে যখন বাষ্পের জাহাজে, কামান থেকে হার্পূন ছোঁড়ার ব্যবস্থা হল, তখন তিমি শিকার সহজ ও নিরাপদ হওয়াতেই তিমিদের সর্বনাশ হ'ল শুরু। লোভের বশীভূত হয়ে অসংখ্য জাহাজ নির্বিচারে তিমি শিকার করতে শুরু করলে। শেষ কালে এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, উত্তর দিকের সমুদ্রে তিমি আর দেখা যায় না বললেই হয়। পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জানোয়ার, যে অতিকায় নীল তিমি একদিন উত্তর আটলান্টিক সমুদ্র তোলপাড় করে ফিরত, আজ
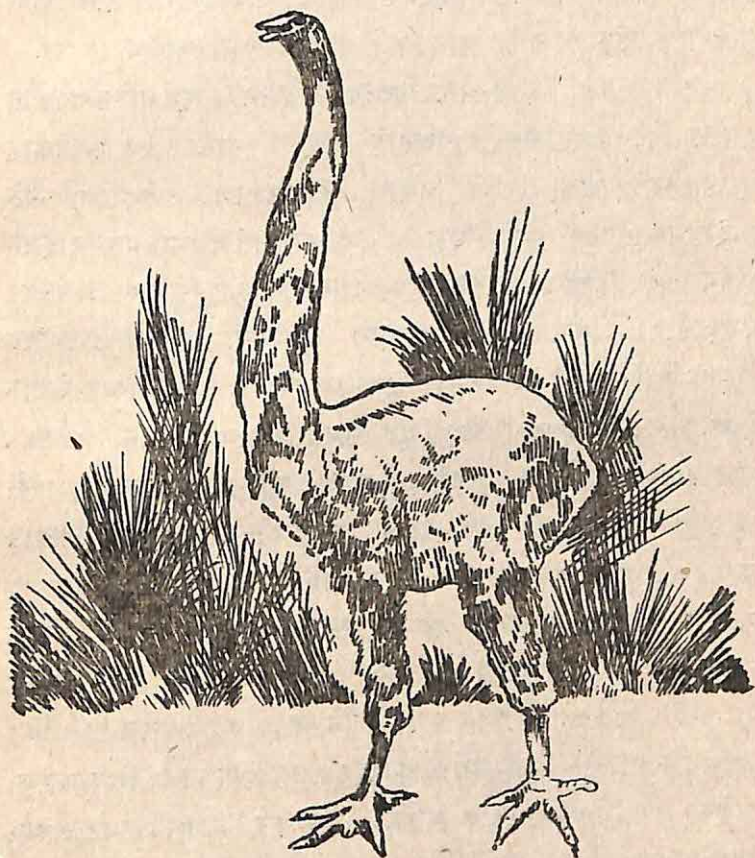
নিউজীল্যাণ্ডের অস্ট্রীচ জাতীয় অধুনালুপ্ত মোয়া পাখী

তাদের একটিরও দেখা পাওয়া দুর্লভ! তিমি-শিকারী জাহাজ চেষ্টা করলেও উত্তর-সমুদ্রে আর মারবার কিছু খুঁজে পাবে না। এখন এই সব তিমি-শিকারী জাহাজ দক্ষিণ-মেরুর দিকে তিমির খোঁজে ফেরে, অবাধে সেখানেও তাদের তিমি হত্যা করতে দিলে পৃথিবীতে কিছুদিন বাদে আর তিমি থাকবে কিনা সন্দেহ।

তিমির মত, উত্তর-আমেরিকার 'বাইসন' নামে মহিষ জাতীয় প্রাণীর বিলোপের জন্য শ্বেতাঙ্গরাই একমাত্র দায়ী। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম দিকের বিশাল প্রান্তরগুলি এককালে এই বাইসনের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। এক এক পালে লক্ষ লক্ষ বাইসন তখন এই বিশাল দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত চরে বেড়িয়েছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড-ইণ্ডিয়ানদের অনেক জাতির এই বাইসনই একমাত্র শিকার ও জীবিকার উপায় ছিল। তারা তল্পি-তল্পা তাঁবু নিয়ে এদের পিছনে পিছনেই দেশময় ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আহারের জন্যে যেটুকু প্রয়োজন তার বেশী তারা কখনো হত্যা করত না! বহু প্রাচীনকাল থেকে শিকার করে এলেও, বাইসন তাদের হাতে তাই লোপ পায় নি। ১৮৭১ সালেও আরাকানসাসের একজন পর্যটক পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে যাবার সময় বাইসনের একটি বিরাট পালের সাক্ষাৎ পান। ২৫ মাইল ধরে শুধু বাইসন ছাড়া তিনি আর কিছু দেখতে পান নি। তিনি লিখেছেন—"মাটি আর কোথাও দেখা যায় না। শুধু কালো মহিষ। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলে মনে হয়, কালো জলের একটা দেশ-জোড়া বন্যা যেন দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে বয়ে চলেছে।" এ রকম বড় পাল সে সময় আরো অনেকে দেখেছে। একটি পালে খুব কম করে হিসেব করেও অন্ততঃ চল্লিশ লক্ষ বাইসন আছে বলে সে দিন জানা গিয়েছিল।

কিন্তু ১৮৭১ সালে একটি পালেই যেখানে চল্লিশ লক্ষ প্রাণী

দেখা যেত, ১৮৯৭ সালে সেখানে একটি বন্য বাইসনও আর দেখা গেল না। ভোজবাজিতে সমগ্র আমেরিকা থেকে বাইসন যেন উবে গেল। আমেরিকার বাইসনের বিলোপ যে কত তাড়াতাড়ি হয়েছে, সেখানকার একটি রেল কোম্পানির চামড়ার চালানের হিসাব দেখলেই বুঝা যাবে। ১৮৮২ সালে যে রেল কোম্পানি দিয়ে ২ লক্ষ চামড়া চালান দেওয়া হয়, ১৮৮৩-তে হয় ৪০ হাজার, ১৮৮৪-তে হয় মাত্র ৩০০ আর ১৮৮৫-তে একটিও চামড়া চালান যায় নি। এত অল্প সময়ে এমন আশ্চর্যভাবে আমেরিকা বাইসন-শূন্য হয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ অবশ্য ইউরোপের লোকের চামড়ার লোভ। সেদিন আমেরিকায় যে যেখানে পেয়েছে যত খুশী অবাধে বাইসন হত্যা করেছে এই চামড়ার লোভে। অতিরিক্ত ডিমের লোভে, যে হাঁস ডিম দেয় তাকেও মেরে ফেলা হচ্ছে এ হুঁশ কারুর সেদিন হয় নি। হুঁশ হল যেদিন আমেরিকার সীমাহীন প্রান্তরে বাইসনের রাশীকৃত সাদা হাড় ছাড়া অতীতের অগণন বাইসনযূথের অস্তিত্বের সাক্ষী আর কিছু রইল না। চামড়ার ব্যবসা শেষ হবার পর, জমির সার হিসাবে এই হাড়ের ব্যবসা করেও সেখানকার লোক অনেক দিন চালিয়েছে। যাদের অস্ত্রে প্রাণ দিয়েছিল, বাইসনযূথ মৃত্যুর পর অস্থি দিয়ে তাদের জমিই তারা উর্বরা করে দিয়ে গেল।

আমেরিকার কোন কোন পশু-সংরক্ষণী-উদ্যানে এখন কয়েকটি মাত্র পোষা বাইনস দেখা যায়, তাদের স্বাধীন জ্ঞাতি খুঁজতে হলে এখন যেতে হবে কানাডার ম্যাকেঞ্জি নদীর অঞ্চলে। সেখানে বাইসনের সগোত্র এক রকম মহিষ এখনও বন্য অবস্থায় বিচরণ করে।

তিমি ও বাইসনের বেলায় মানুষকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে দোষী বলা চলে, ডোডো পাখীর বেলা তেমন চলে না। ডোডো মরিশাস দ্বীপের এক্ রকম বড় পাখী, দেখতে খানিকটা পাতিহাঁসের

মত হলেও, তারা পায়রারই দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি। চেহারা যেমন কদাকার, তেমনি তারা বুদ্ধিহীন ও সব বিষয়ে আনাড়ি। না পারে তারা আকাশে উড়তে, না চটপট ডাঙ্গায় দৌড়োতে। মরিশাস দ্বীপে সভ্য মানুষের পদার্পণের ফলেই ডোডো পাখী লোপ পায়, কিন্তু মানুষ নিজ হাতে তাদের ঠিক উচ্ছেদ করেছে বলা চলে না, মানুষের আমদানি-করা ইঁদুর, শূয়ার ও বানরই মরিশাস দ্বীপ থেকে এই নিরীহ নির্বোধ প্রাণীটিকে বিলুপ্ত করে দেয়। যে সমস্ত ইউ-রোপীয় নাবিক প্রথম মরিশাস দ্বীপে নামে, তারা ডোডো পাখীকে দয়া করেছিল ভাবলে কিন্তু ভুল হবে। পাখীটির মাংস খাবার উপযুক্ত নয়, অন্য কোন জিনিসও তার দেহ থেকে পাওয়া যেত না, তবুও প্রথমে পর্তুগীজ ও পরে ওলন্দাজ নাবিকেরা অহেতুক হিংসাবশে মাথায় মুগুর মেরে যে দ্বীপের অসংখ্য ডোডো পাখী সংহার করে। নির্বোধের মত পাখীগুলি লগুড়ের ঘায়ে নিহত হ'ত বলেই তাদের নাম ওলন্দাজেরা দেয় ডোডো। ডোডো মানে ওলন্দাজ ভাষায় বেকুফ। পর্তুগীজেরা মরিশাস দ্বীপ আবিষ্কার করে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬৮১ সালে সেখানে একটি ডোডো পাখীও আর দেখা যায় না। দশ বছরও যারা মানুষের সভ্যতার আওতায় টিঁকতে পারল না, তাদের ত' বোকা বলাই সঙ্গত।

ডোডো পাখীর অনেক পরে আর একটি পাখী পৃথিবী থেকে লোপ পেয়েছে, কিন্তু সত্য কথা বলতে গেলে ইউরোপীয়দের তাদের বিলুপ্তিতে কোন হাত নেই। এ পাখীর নাম 'মোয়া'—তাদের বাস ছিল নিউজীল্যাণ্ডে। মোয়া আফ্রিকার উট পাখীরই সগোত্র, তবে আকারে অনেক বড়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারো ফুট লম্বা অর্থাৎ লম্বা লম্বা দুটি মানুষের সমান 'মোয়া' বিরল ছিল না। নিউজীল্যাণ্ডের মাওরী জাতি শ' পাঁচেক বছর আগে

তাদের প্রধান বাসস্থান থেকে উত্তরের একটি দ্বীপে পৌঁছে 'মোয়া' প্রথম আবিষ্কার করে। তার মাংস সুস্বাদু বলে এবং নিউজীল্যাণ্ডে বড় প্রাণী আর কিছু না থাকাতে 'মোয়া' মাওরীদের প্রধান শিকার হয়ে ওঠে এবং একশ বছরের মধ্যেই উত্তরের দ্বীপ থেকে একেবারে লোপ পায়। উত্তরের দ্বীপে আগে লোপ পেলেও নিউজীল্যাণ্ডের দক্ষিণ দ্বীপে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত 'মোয়া' যে টিঁকে ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবু কোন ইউরোপীয়ের জীবন্ত 'মোয়া' পাখী চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। দক্ষিণের দ্বীপে 'মোয়া' পাখীর লোপ পাওয়াও ভারী বিস্ময়কর ব্যাপার। মাওরীরা সেখানে গিয়ে সমস্ত 'মোয়া' মেরে যে ফেলেনি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সমস্ত দুর্ভেদ্য দুর্গম জায়গায় প্রচুর পরিমাণে 'মোয়া'র কঙ্কাল পাওয়া গেছে, মাওরীরা সেখানে কোন কালে ঢুকতে পারে নি। তা সত্ত্বেও 'মোয়া' কেমন করে সবংশে সেখানে লোপাট হয়ে গেল, সে রহস্যের যথার্থ মীমাংসা বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্যন্ত করতে পারেন নি।

শুধু মোয়া নয়, পৃথিবীর অনেক প্রাণীই কেন যে লোপ পেয়েছে ও পাচ্ছে, তার কোন সদুত্তর এখনো বৈজ্ঞানিকেরা দিতে পারেন না। আফ্রিকার গহন জঙ্গলের জিরাফের জ্ঞাতি 'ওকাপি', ভুটানের পার্বত্য প্রদেশের আধা-ভেড়া আধা-মহিষ 'টাকিন,' ব্রেজিলের দীর্ঘপাদ লাল নেকড়ে, মঙ্গোলিয়ার বন্য ঘোড়া প্রভৃতি জন্তু, সমশ্রেণীর 'বর্দ্ধিষ্ণু' প্রাণীদের চেয়ে বুদ্ধিতে বা বলে এমন কিছু খাটো বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবু কেন যে তারা কালের বিবর্তনের মিছিল থেকে পথের পাশে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে ও হচ্ছে, তার রহস্য এখনও গভীর পরিমাণে অন্ধকারে আবৃত।

বনমানুষের কথা

চিড়িয়াখানায় গেলে ছেলেদের সবচেয়ে ভিড় বোধহয় দেখা যায় ওরাংওটাং-এর আস্তানার কাছে। এমন মজার 'জানোয়ার আর নেই। সার্কাসের পেশাদার ভাঁড়কেও তারা দু'চারটে কায়দা বোধহয় শিখিয়ে দিতে পারে। বুড়ো মানুষের মত গম্ভীর মুখে তারা সারাদিন যে সব মজার কাণ্ড করে, তাতে হাসি চেপে রাখা অত্যন্ত শক্ত। মানুষের চেহারার সঙ্গে তাদের মিল আছে বলেই তাদের খেলায় এত বেশী আমোদ পাওয়া যায়। বাঁকা বাঁকা পায়ে টলমল করে ঘুরে ফিরে তারা যখন নানা অদ্ভুত মজা করে, তখন মনে হয় কোন মানুষই যেন এমনি করে সেজে সকলকে হাসাবার চেষ্টা করছে।

মানুষের সঙ্গে তাদের এই মিলের জন্যই ওরাংওটাং-এর নাম বনমানুষ দেওয়া হয়েছে। বনমানুষকে সাধারণতঃ বানর বলে মনে হলেও তারা সগোত্র নয়। বনমানুষ আর বানরে যে তফাত আছে তা একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই টের পাওয়া যায়। বনমানুষের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাদের লেজ নেই বানরের মত! শুধু লেজের অভাব নয়, আরো অনেক পার্থক্য আছে। মানুষের মত আকার হলেও বানরেরা সাধারণতঃ চার হাত পায়ে চলাফেরা করে। কিন্তু বনমানুষ চলাফেরার জন্যে এক সঙ্গে হাত-পা ব্যবহার করে না; তারা শুধু পায়ের উপর ভর দিয়ে চলতে পারে।

যাদের 'উকু' বলা হয় চিড়িয়াখানায় সেই 'গীবন' জাতীয় বন-মানুষের খাঁচার কাছে গেলেই তাদের এই বিশেষত্ব বুঝতে পারা যাবে।

যবদ্বীপের রজতবর্ণ গীবন

'উকু' আর ওরাংওটাং ছাড়া পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আরও দু'জাতের বনমানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। শিম্পাঞ্জি এবং গরিলা ; এরাও বনমানুষেরই দুটি শ্রেণী।

উকু বা গীবন আর ওরাংওটাং আমাদের এদিকেরই বাসিন্দা। বর্মা ও মালবের জঙ্গলে, বোর্ণিওতে, জাভায় ও সুমাত্রায় গীবন দেখা যায়। বনমানুষের ভিতর এরাই সবচেয়ে আকারে ছোট। সবচেয়ে বড় জাতের গীবনও ওজনে পনেরো সেরের বেশী হয় না। কিন্তু ছোট হলেও সমস্ত বনমানুষের ভিতর সাধারণতঃ সোজা হয়ে এই জাতির বনমানুষই হাঁটে। ছোট বড় প্রায় দশ রকমের গীবনের খবর পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় জাতের নাম হল সিয়ামাং। মালবের দক্ষিণ আর সুমাত্রায় এদের বাস। গীবনের মত এমন চট্‌পটে চঞ্চল জানোয়ার আর কিছু নেই। জঙ্গলের ঘন গাছপালার মধ্যে বিদ্যুতের মত তারা ডাল থেকে ডালে দোল খেয়ে লাফিয়ে বেড়াতে পারে। হাতগুলি এদের অসম্ভব রকম লম্বা আর জোরও অসাধারণ। জঙ্গলের তারা সবচেয়ে ওস্তাদ খেলোয়াড়, একলাফে ২৬-২৭ হাত পার হয়ে যাওয়া তাদের কাছে এমন কিছু একটা শক্ত কাজ নয়।

গীবন যেমন চট্‌পটে ও চঞ্চল, ওরাংওটাং তেমনি গম্ভীর। চেহারায় যেমন বুড়ো মানুষের মত, কাজেও তারা তেমনি। দৌড়ঝাঁপ ছুটাছুটি তাদের ধাতে নেই। তারা বেশীর ভাগ গাছে থাকে, মাটিতে নামে কদাচিৎ। বনমানুষের ভিতর ওরাং-রাই সবচেয়ে নিরীহ শান্ত।

বোর্ণিওর পশ্চিমে আর সুমাত্রার উত্তর-পশ্চিমের ঘন জঙ্গলেই ওরাংওটাং-এর বাস। সবসুদ্ধ এই দুই জঙ্গলে হাজার চল্লিশ ওরাং আছে কিনা তাও সন্দেহ। এ সংখ্যাও ক্রমশঃ কমে আসছে।

জন্মাবার সময় ওরাং-এর বাচ্চার ওজন মানবশিশুর ওজনের

পুরুষ গরিলার দাঁত আক্রমণের জন্যে বিশেষ এক হাতিয়ার

তিন ভাগের এক ভাগ থাকে মাত্র, কিন্তু ধাড়ী ওরাং ওজনে আড়াই মণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। চোদ্দ বৎসরে ওরাং জোয়ান হয়ে ওঠে, বাঁচে চল্লিশের কিছু বেশী। বুড়ো মদ্দা ওরাং দেখলেই চেনা যায়। তাদের গলার দু'ধারে থলির মত মাংসের এক রকম পুঁটুলি হয়।

ওরাংরা গাছের উপর ডালপালা দিয়ে মাচা তৈয়ারী করে শোয়ার জন্যে। শিম্পাঞ্জি ও গরিলার মত এদেরও শোয়ার অভ্যাস মানুষেরই মত। দাঁড়িয়ে বা বসে অন্য জানোয়ারের মত এরা ঘুমোতে পারে না।

মাচা তৈরীতে ওরাংরা অত্যন্ত পটু। একবার লণ্ডনের চিড়িয়াখানা থেকে একটি ধাড়ী ওরাং কোন রকমে পালিয়ে যায়। আধ ঘণ্টা বাদে তার খোঁজ যখন পাওয়া গেল তখন দেখা গেল, এইটুকু সময়ের মধ্যেই কাছের একটি গাছে সে বেশ একটি মজবুত মাচা তৈরী করে তার উপর বসে আছে।

গীবন এবং ওরাং ছাড়া পৃথিবীর আর দু'জাতের বনমানুষের বাস আফ্রিকায়। বিষুব রেখাকে অনুসরণ করে পশ্চিমের সিয়েরা লিয়োন থেকে পূর্বের হ্রদ-প্রদেশ পর্যন্ত আফ্রিকায় একটি গহন দুর্ভেদ্য অরণ্য বিস্তৃত। এ অরণ্য প্রায় তিন হাজার মাইল লম্বা ও স্থান-বিশেষে তিন শত থেকে আট শত মাইল চওড়া। সভ্য মানুষ এই গভীর অরণ্যের সব রহস্য এখনও জানতে পারে নি। এই অরণ্যই গরিলা ও শিম্পাঞ্জির বাসস্থান। আয়তনে এই অরণ্য সমস্ত ভারতবর্ষের চেয়ে বেশী হলেও তাতে সবসুদ্ধ সওয়া লক্ষের বেশী শিম্পাঞ্জি নেই বলে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন।

শিম্পাঞ্জিরা এক একটি পরিবার একত্র হয়ে এক সঙ্গে বাস করে। নানা বয়সের পুরুষ মেয়ে মিলিয়ে বারো থেকে চল্লিশটি শিম্পাঞ্জিকে এক পরিবারে দেখা যায়।

শিম্পাঞ্জিকে বনমানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলা হয়।

অত্যন্ত সহজে মানুষের পোষ মেনে মানুষের চাল-চলনের অনুকরণ করতে তার জুড়ি নেই। শিক্ষিত শিম্পাঞ্জিদের মানুষের মত নানা বুদ্ধির কাজ করার কথা আমরা জানি।

মস্তিষ্কের ওজন থেকে শিম্পাঞ্জির এ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। গরিলা ও ওরাং-এর আকার ও মস্তিষ্কের ওজন শিম্পাঞ্জির চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু সে যাই হোক, শিম্পাঞ্জির মত এমন আমুদে স্ফুর্তিবাজ জানোয়ার আর নেই। ওরাং-এর তুলনায় সে ঢের বেশী চটপটে ও মিশুক বলে মানুষের কাছে তার আদর অনেক বেশী।

শিম্পাঞ্জি ওজনে প্রায় মানুষেরই সমান। দেড় মণ থেকে সওয়া দু'মণ সাধারণতঃ তাদের ভার। মাথায় কিন্তু সাড়ে চার ফুটের উঁচু তারা হয় না। শরীরের উপরের অংশের তুলনায় তাদের পায়ের দিক বেশ হ্রস্ব।

শিম্পাঞ্জির ছানাও ওরাং-এর মত জন্মাবস্থায় অত্যন্ত ছোট থাকে। প্রথম বছরখানেক মাতৃস্তন্যই তাদের একমাত্র আহার। মানুষের শিশুর মত তাদের ছ'মাসে প্রথম দাঁত ওঠে না, ওঠে দুই মাসেরই ভিতর। দুধে-দাঁত পড়ে গিয়ে মানুষের শিশুর আসল দাঁত উঠতে আরম্ভ হয় প্রায় ছ'বছর বয়সে, কিন্তু শিম্পাঞ্জির নতুন দাঁত চার বছরে উঠতে থাকে। শিম্পাঞ্জি ও মানুষের দাঁত সংখ্যায় ও বৈশিষ্ট্যে এক।

শিম্পাঞ্জি-বাচ্চাকে বছর চারেকের হলেই স্বাধীনভাবে নিজের দায় নিজেকে সামলাতে হয়। পনেরো বছর বয়সে সে জোয়ান হয়। ওরাং-এর মত চল্লিশ বছরেই সে বেশ বুড়ো হয়ে পড়ে, প্রায় সত্তর বছরের মানুষের সমান।

বনমানুষের ভিতর সবচেয়ে বৃহত্তম ও রহস্যময় হল গরিলা। অন্যান্য বনমানুষের কথা সভ্য জগতে অনেক দিন আগেই কিছু

কিছু জানা ছিল। কিন্তু গরিলা সেদিন পর্যন্ত একেবারে অজ্ঞাত ছিল। আফ্রিকার দুর্ভেদ্য জঙ্গলের বিশাল বিভীষিকা রূপে এই প্রাণীটি অনেক আজগুবি গল্পের খেয়াল জুগিয়েছে। সত্য-মিথ্যায় মিলিয়ে গরিলা সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক কাহিনী শিকারীরাও প্রচার করেছেন।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ স্যাভেজ নামে একজন মার্কিন পাদ্রী ফরাসীদের শাসনাধীন আফ্রিকায় গাবুন প্রদেশে পর্যটনের সময় গরিলার অস্তিত্ব প্রথম সভ্য জগতের গোচর করেন, কিন্তু গরিলা তখনও আজগুবি জানোয়ার বিশেষ। বিশাল আকার, তার বাসস্থানের দুর্গমতা সমস্ত মিলে তার চারিধারে এমন রহস্যজাল বিস্তার করে দিল যে বন্দুক নিয়ে যে সমস্ত শিকারী তার সম্মুখীন হবার সাহস করেছিলেন তাঁরা প্রত্যক্ষ দেখবার সুযোগ পেয়েও তার সঠিক সংবাদ আনতে পারেন নি। নিজেদের অজ্ঞাতে তাঁদের বিবরণ সাধারণ কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত হয়েছে।

অবশ্য এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা বলবার আছে। বন্দুক হাতে লক্ষ্যভেদই করা সম্ভব, কিন্তু কোন প্রাণীর জীবন-যাপনের রহস্যভেদ তার দ্বারা করা যায় না। তার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন প্রয়োজন।

ধীরে ধীরে আধুনিক কালের জীব-বিজ্ঞানবিদেরা সেই পদ্ধতির সার্থকতা উপলব্ধি করেছেন। নিরীহ বা হিংস্র কোন জানোয়ারকে আজকাল তাঁরা শুধু শিকার করতে বার হন না। দুর্ভেদ্য অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে সেই প্রাণী নিজের আবেষ্টনে কি ভাবে জীবন-যাপন করে, তাই লক্ষ্য করাই এখন তাঁদের উদ্দেশ্য। এই ভাবেই তাঁরা আধুনিক জীব-বিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে গরিলাকে দেখবার চেষ্টা করেন প্রথম ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্যু চাইল্যু। তারপর অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম

করে নিজেদের জীবন নানাভাবে বিপন্ন করে বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্যময় অতিকায় প্রাণীটির সাধারণ অরণ্য-জীবনযাত্রার অনেক কথা জানতে পেরেছেন।

গরিলা সম্বন্ধে তথ্য-সংগ্রহের প্রধান বাধা এই যে, আফ্রিকার বিষুব-রেখার দু'ধারের অরণ্যের যে যে অংশে তারা বিচরণ করে, সে অংশের চেয়ে দুর্গম, অস্বাস্থ্যকর ভয়ঙ্কর স্থান পৃথিবীতে আর নেই বললেই হয়। আফ্রিকার অসভ্য অধিবাসীরাও সে সমস্ত স্থান এড়িয়ে চলে।

দেখতে যত ভীষণই হোক গরিলা কিন্তু সাধারণতঃ হিংস্র নয়। নেহাত উত্যক্ত না হলে সে আক্রমণ করে না। কিন্তু একবার সে ক্ষেপে গেলে আর রক্ষা নেই, সাক্ষাৎ মৃত্যুর চেয়ে সে তখন ভয়ঙ্কর। কি যে শক্তি তার বিশাল দেহে, অস্ত্র হিসাবে তার তীক্ষ্ণ দাঁত যে কি ভয়ঙ্কর, তার ক্রোধ যে কি পৈশাচিক তার পরিচয় তখনই পাওয়া যায়। তার পরিবারের কেউ বিপন্ন হলে গরিলা পালাতে জানে না। এ সময় তার প্রাণের ভয় একেবারেই থাকে না।

শিম্পাঞ্জির মত গরিলাও সপরিবারে বাস করে। কিন্তু তাদের পরিবারের লোকের সংখ্যা বেশী নয়। এক একটি পরিবারে আট দশটির বেশী থাকে না। বিশালকায় প্রবীণ একটি গরিলার নেতৃত্বেই সমস্ত পরিবার চলাফেরা করে। দু'একটি জোয়ান গরিলা এই নেতার সাকরেদী করে। ছোট ছোট বাচ্চা, তিন চারটি মেয়ে-গরিলা সমস্ত দলেই দেখা যায়। সারাদিন তারা আহারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। বাঁশের নরম কোঁড়, নানা রকম রসাল মূলই তাদের প্রধান খাদ্য। আহার সম্বন্ধে তাদের কোন রকম শৌখিনতা নেই। তাদের প্রয়োজন শুধু প্রচুর খাদ্যের। তারা আফ্রিকার অসভ্যদের চাষের জমিতেও মাঝে মাঝে হানা

দেয় আহারের সন্ধানে। কলাগাছের কচি চারা ও আখ তাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। রাত্রে কোন গাছের তলায় ডালপালা বিছিয়ে ধাড়ী গরিলা তার শয্যা তৈয়ারী করে। পরিবারের অন্যান্য গরিলারা কাছাকাছি গাছের উপর মাচা তৈরী করে ঘুমোবার আয়োজন করে। অন্যান্য গরিলারা সে জায়গা থেকে বেশী দূরে কখনও যায় না।

বিশালতায় গরিলার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না। সাধারণ একটি গরিলা ওজনে আড়াই থেকে তিন মণ পর্যন্ত হয়। বিখ্যাত শিকারী মিঃ বার্নস্ কিভু হ্রদের কাছে আগ্নেয়-পর্বতের অরণ্যে সবচেয়ে বিশালকায় একটি পুরুষ গরিলা শিকার করেন। দশ জন বলিষ্ঠ অসভ্য কাফ্রী যেটাকে বয়ে আনতে হয়রান হয়ে গিয়েছিল। তার ওজন ছিল পাঁচ মণেরও বেশী।

গরিলার দৈর্ঘ্য কিন্তু ওজনের তুলনায় খুব বেশী হয় না। পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফুটই সাধারণতঃ তাদের দৈর্ঘ্যের সীমা। ছ'ফুট লম্বা গরিলা এক রকম বিরল।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, গরিলা ও শিম্পাঞ্জি প্রাণী-জগতের একই মূল ধারার দুইটি শাখা। কোন সুদূর অতীতে এক ধারা থেকে বার হলেও তারা এখন একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। শরীরের বিশালতা ও শক্তিবৃদ্ধির দিকেই গরিলার বিবর্তন হয়েছে। জোয়ান, পরিণত-বয়স্ক একটি গরিলার কাছে আমাদের সবচেয়ে বড় পালোয়ানও নগণ্য। সাধারণ একটি গরিলা পাঁচজন বলিষ্ঠ মানুষকে কাবু করতে পারে।

শরীর বিশাল হয়ে পড়ার জন্যই গরিলাকে গাছের ডালের স্বাভাবিক আশ্রয় ত্যাগ করে বেশীর ভাগ মাটির উপর কাল কাটাতে হয়। বড় বড় ধাড়ী গরিলার চলাফেরার পক্ষে কোন গাছের ডালই বিশেষ নিরাপদ নয়।

অন্যান্য বনমানুষের মত গরিলা-শিশু জন্মায় অত্যন্ত ছোট হয়ে। মানুষের শিশুর প্রায় অর্ধেক তার ওজন। শিশু গরিলা ও শিম্পাঞ্জির মধ্যে পার্থক্য বোঝা কঠিন। শুধু নাক আর দাঁতের বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাদের তফাত করা যায়। গরিলার নাকের ছিদ্র একটু বড়, নাকের ছিদ্রের ধারগুলিও অপেক্ষাকৃত উঁচু। নাকের সেই উঁচু-কাণা উপরের ঠোঁটের সঙ্গে গিয়ে মিলেছে। সেই গরিলার দাঁত কিন্তু সমস্ত বনমানুষ থেকে একেবারে আলাদা। নীচের ও উপরের কুকুর-দাঁতগুলি তাদের যেমন বড়, তেমনি তীক্ষ্ণ। শিম্পাঞ্জির চেয়ে গরিলার কান অনেক ছোট, সেগুলি ছড়ানও নয়।

শিম্পাঞ্জির ছানার সঙ্গে গরিলার ছানার একই সময়ে দাঁত ওঠে, তারা সাবালকও একই বয়সে হয়। কিন্তু গরিলা বেড়ে ওঠে অনেক তাড়াতাড়ি। সাধারণতঃ গরিলার গায়ের লোম কালো, তাতে লালের আভাস একটু পাওয়া যায়। বুড়ো গরিলার চুল মানুষের মত শাদা হতে দেখা যায়।

গরিলার সঙ্গে শিম্পাঞ্জির আর একটি তফাত প্রকৃতির দিক দিয়ে। শিম্পাঞ্জি যেমন আমুদে, গরিলা তেমনি গম্ভীর। বাচ্চা গরিলাকে ধরে রেখেও দেখা গিয়েছে, তাদের ভিতর চঞ্চলতা নেই বললেই হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাদের চাল-চলন গম্ভীর, আত্মস্থ। সহজে সে মিশতে চায় না কারুর সঙ্গে।

পৃথিবীর অন্য পিঠে

মানুষ যাতে বসতি করতে পারে এমন জমি পৃথিবীতে খুব কম জায়গাতেই পতিত আছে। পৃথিবীতে এই ধরনের সবচেয়ে বিশাল জায়গা এখনো দক্ষিণ আমেরিকার মাঝখানেই দেখা যায়। সেই জায়গার অধিকাংশ আবার বলিভিয়ার এলাকায় পড়ে।

বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আগে কয়েকজন ইংরাজ এই উদ্দেশ্যে বলিভিয়ার সরকারের কাছে প্রায় দশ কোটি বিঘা জঙ্গল ও চাষের জমি ইজারা নেয়। মানুষের বাসহীন এই অজানা জঙ্গলময় দেশ জয় করতে হলে প্রথমে দরকার যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা। এই কাজেই কয়েকজন দুঃসাহসী লোক বলিভিয়ার 'পারানা' নদীর অজানা উৎসের দিকে যাত্রা করে। তাদের সেই যাত্রার কিছু বিবরণ এখানে দেওয়া যাক।

'প্রেসিডেন্ট সাভেন্দ্রা' নামে একটি স্টীমার তাদের বাহন। স্টীমারটি ছোট হলে কি হয়, বেশ মজবুত। বিশাল নদীর মাঝখান দিয়ে অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ ও চড়া বাঁচিয়ে স্টীমার চলেছে। দু'ধারে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। বিশাল অজগরের মত লিয়ানা বা দড়িগাছ সে জঙ্গলকে যেন আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে রেখেছে।

দক্ষিণ আমেরিকার জঙ্গলের একটি বিশেষত্ব হল এই লিয়ানা। এই গভীর জঙ্গলে থেকে থেকে অসংখ্য কীট-পতঙ্গের গুঞ্জন ও অন্যান্য শব্দ ছাপিয়ে জাগুয়ারের তীক্ষ্ণ কাঁদুনে ডাক শোনা যায়। কখন কখন দু' একটি নদীর ধারে জল খেতেও দেখা যায়। এই জাগুয়ার মারা কিন্তু সহজ নয়। স্টীমার থেকে তাদের মারবার জন্যে বোট নামাবার আয়োজন করতে গেলেই কেমন করে তারা টের পেয়ে গহন বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। তীরে নেমেও তখন তাদের সন্ধান করা কঠিন। জাগুয়ারেরা গাছে চড়তে ওস্তাদ। গাছের ঘন লতা-পাতার মধ্যে লুকিয়ে থাকলে তাদের খুঁজে বার

করা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও বলভিয়ার জাগুয়ার-শিকারী এক রকম কুকুরের সাহায্যে, কয়েকটি জাগুয়ার স্টীমারের লোকেরা মারে।

জঙ্গলে জাগুয়ার দুষ্প্রাপ্য হলেও জলের কুমীর অতটা দুর্লভ নয়। নদীর ধারে ধারে কুমীরের জটলা, লম্বায় তারা এক একটি দশ বারো হাতেরও বেশী। গায়ানা নদীর কুমীর অবশ্য ঠিক আমাদের দেশের মত নয়, তাদের জাত আলাদা। তাদের Crocodile না, Alligator বলা হয়। স্টীমার থেকে লাইফ বোটে নেমে নাবিকেরা অনেকগুলি এই কুমীর শিকার করে।

এই নদীর দুশমন কিন্তু শুধু এই কুমীর নয়। 'পিরানা' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে হিংস্র এক জাতের মাছ এই 'পারানা' নদীতে দলে দলে ঘুরে বেড়ায়। জলে তারা সকল প্রাণীর যম, তাদের পাল্লায় পড়লে কারুর আর রক্ষা নেই। ইস্পাতের মত ধারালো দাঁতে তারা যে কোন প্রাণীকে জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়। প্রেসিডেন্ট সাভেন্দ্রার যাত্রীদের এ বিষয়ে নিদারুণ এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

পথের মাঝে এক জায়গায় স্টীমার থেকে একজন জার্মান নাবিক অকস্মাৎ পা ফসকে জলে পড়ে যায়, সাঁতার সে খুব ভালো রকমই জানত, কিন্তু সাঁতার কাটবার সুযোগ আর তার মেলেনি। জলে পড়বামাত্র অসংখ্য 'পিরানা' মাছ চারিধার দিয়ে তাকে ছেঁকে ধরে। একবার মাত্র সে চীৎকার করে উঠেছিল, তারপর—ঘোলা লাল জল ছাড়া আর তার চিহ্নও দেখা যায়নি।

শুধু পশু ও মাছ নয়, এদেশের অসভ্য আদিম অধিবাসীরাও ভয়ঙ্কর রকম হিংস্র। গভীর জঙ্গলের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারদের মতই তারা স্বাধীন বন্যজীবন যাপন করে। অস্ত্র বলতে তারা তীর-ধনুক, বল্লম ও তীর ছোড়বার এক রকম চোঙ্গা ছাড়া আর কিছু জানে না। কিন্তু এগুলি সামান্য হলেও এ অস্ত্র তাদের হাতে সাঙ্ঘাতিক। তীরের ফলায় তারা 'কুবের' নামে এক রকম

মারাত্মক বিষ মাখিয়ে রাখে। সে বিষ এমন ভয়ঙ্কর যে, তীরের ফলার সামান্য একটু আঁচড় লাগলেই দশ বারো মিনিটের মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত।

এই বিষের রহস্য এখনও সভ্য মানুষের অজানা। অসভ্যদের ভাইটেন বিদ্যায় দুরন্ত ওঝারা শুধু তার উপাদান জানে। এক রকম লতাগাছের শেকড় ও আর এক প্রকার লতাগাছের ফল মিশিয়ে নাকি এ বিষ তৈরী হয়। বলিভিয়ার 'তুকান্দেরাম' নামে ভয়ঙ্কর কালো পিঁপড়ে কয়েকটি বেটেও নাকি এই বিষে মেশান হয়। এই কালো পিঁপড়ের কামড়ও মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক।

জলেস্থলে যে দেশের প্রাণীজগৎ এমন হিংস্র, সেখানে প্রকৃতির শোভা কিন্তু অপরূপ। এত বিচিত্র সুন্দর ফুল খুব কম জঙ্গলেই দেখা যায়। গাছে গাছে অসংখ্য নূতন অজানা জাতের অর্কিড, অসংখ্য নূতন ফুল ফুটে আছে। ফুলে ভরা এই জঙ্গলে যে সব পাখী উড়ে বেড়ায়—তারাও যেমন অফুরন্ত, তেমনি সুন্দর। এখানে যেমন চড়ুই পাখী, সেখানে তেমনি রং-বেরং-এর টিয়া, কাকাতুয়া জাতের পাখী অজস্র, টুকান, ফ্ল্যামিঙ্গো, সারস প্রভৃতি পাখী যে কত রকম তার লেখাজোখা নেই।

জঙ্গলের হিংস্রতার সঙ্গে এ শোভাও কিন্তু বেশীদিন আর থাকবে না। অজানা নদীপথে স্টীমারের প্যাডলের শব্দে পরিবর্তনের ভবিষ্যদ্বাণী শোনা যাচ্ছে। জাগুয়ার ও অসভ্য মানুষদের ঘোরবার জায়গায় সভ্য জনপদ বসবে। হিংস্র পিরানা মাছ ও কুমীরের যেখানে ছিল একাধিপত্য সেখানকার জল মোটরবোট ও স্টীমারের আলোড়নে ঘুলিয়ে উঠবে। ফুলে পাখীতে অপরূপ অরণ্য সাফ হয়ে গিয়ে ইট-কাঠের শহর দেখা দেবে হয়ত।

কিন্তু সেও এক রকম জঙ্গল নয় কি? সেখানে ছদ্মবেশে এই হিংস্রতাই কি ঘুরে বেড়ায় না?